দিনে ঔষধ ও ব্যবস্থা-বিতরণকারী পণ্ডিত মহাশয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইত প্রাচীনযুগে ঋষিমূর্ত্তি বুঝি ইহাঁরই অনুরূপ ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা Dominican Friars দিগের ন্যায় তিনি ধনীর অট্টালিকা হইতে দীন-দরিদ্রের কুটীরে অতি দুশ্চিকিৎস্য—করাল ব্যাধিগ্রস্তের শিয়রে দাঁড়াইয়াছেন ইহা সত্য। অনেক স্থলে তাঁহার প্রথম আবির্ভাবে ও আশ্বাসেই পীড়িত ব্যক্তি নিজকে অর্দ্ধরোগমুক্ত মনে করিত। সন্ধ্যার উপাসনাদির পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাগ্রন্থ পাঠ ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান কাজে ব্যয় করিতেন—তাহার পর দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ডাক-যোগে যাঁহারা অবস্থা জানাইয়া ব্যবস্থা চাহিয়াছেন তাঁহা-দিগের সুদীর্ঘ পত্রগুলি ধৈর্য্য ও ধীরতার সহিত পড়িয়া ফেরত ডাকের জন্য তখনই সেগুলির উত্তর লেখা, এই সব সমাধা করিতেই রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইত। তাহার পর ; তাঁহার প্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠ ছিল। গভীর রাত্রিতে আমরা কোনও নিমন্ত্রণ হইতে অথবা কোনও দিন অন্য কোনও স্থান হইতে ফিরিতেছি, মুক্ত দ্বারপথে দেখিতাম তিনি তুলসীদাসের দোঁহা পড়িতেছেন, অথবা মীরাবাই-এর প্রার্থনা পড়িতেছেন ; বলিতেছেন "হে দেব রণছোড়, মীরা স্বামী সম্পদ সকলই ছাড়িয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছে, আজ হইতে একমাত্র তুমিই মীরার আপন রহিলে—আর কেহ রহিল না প্রভু" ইহা পড়িতেছেন এবং অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইহাই তাঁহার ভাবমগ্ন মূর্ত্তি।

পণ্ডিত মহাশয় যে শুধু মহৎকেই শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নয়—সম্ভাব্য মহত্ত্বকেও শ্রদ্ধা করিতেন। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির যে সংবাদ গোপন রহিয়াছে তাহার খোঁজ তিনি রাখিতেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিবরণ, আদর্শগৃহী ভূদেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়াছি। ইহাঁদিগের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ছিল। তিনি কি চমৎকার করিয়া ইহাঁদিগের কথা বলিতেন। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর-ভবনে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া যে শ্লিপ পাঠান তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় লিখিলেন, "আপনাকে আমরা কলিকাতার দর্শনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করি। সেই জন্য দেখা করিতে আসিয়াছি।" শ্লিপ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নামিয়া আসিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-পরিচয় হইল। বাংলা দেশের এক মহা-পুরুষের সহিত অপর মহাপুরুষের মিলন হইল। এদৃশ্য কল্পনাতীত সুন্দর।

অপরাজেয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব বাক-বিভূতির উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন যে, তিনি একদিন বিডন উদ্যানে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিলেন ; বিষয় ছিল 'দুটি কথা'—কেশবচন্দ্রের বাক্যবিন্যাস শব্দ-যোজনা চিন্তা ও যুক্তির চমৎকারিত্ব হৃদয় ও মনের পরম তৃপ্তিসাধক। বক্তৃতার চরমোৎকর্ষ কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন।

মহাত্মা ভূদেবের সহিত তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। যদিও পণ্ডিত মহাশয় বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ভূদেব তখন শিক্ষাবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী—স্কুল ইনস্পেক্টর। তখন রেলওয়ে লাইন দিনাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। ভূদেব নৌকাযোগে দিনাজপুর স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া কাঞ্চনে নৌকা লাগাইতেন—স্কুলের ছাত্রদিগকে ডাকিয়া আম খাওয়াইতেন। একটি আম্রপূর্ণ নৌকা রাখিয়া ছেলেদের বলিতেন, "তোমরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাও আমি দেখি"। ভূদেবকে পণ্ডিত মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিতেন। অথচ পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্ম্মমত ও ভূদেবের ধর্ম্মমত হয় ত ঠিক এক ছিল না। দুজনই পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু একজন আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ-পাতী অপরজন ব্রহ্মবাদী হিন্দু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের পোর-জেলিয়র (পাবনা) থাকা কালে ঘনিষ্ঠতা হয় মহর্ষির সাজাদপুর কাছারীতে। পণ্ডিত মহাশয় মহর্ষির অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। সাজাদপুরে আসিলেই মহর্ষি পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিয়া লইয়া আসিতেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও সমাজসংস্কারের দূরদর্শিতায় মহর্ষি অতুলনীয় ছিলেন, ইহা পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে বহুবার শুনিয়াছি।

রাজা রামমোহনের কোনও কথা উঠিলে পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন 'রাজা এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি কত বিভিন্ন বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন,' কিন্তু সবগুলিতেই তাঁহার বিরাট মনীষা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বিশদভাবে বলিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া চলিবে। তাঁহার সম্বন্ধে বহুপ্রকার বলিবার ও লিখিবার আছে। সাগরকে বিশ্লেষণ করা যায় না, পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যও কথায় বুঝান সহজ নহে।

পণ্ডিত মহাশয় নিজের জীবন পরহিতার্থে বলি দিয়াছেন। ভবিষ্যতে কেহ যদি দিনাজপুরের ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয় সেই ইতিহাসের গৌরবময় একটি অধ্যায় আলো করিয়া থাকিবেন।

দেশের যথার্থ হিতের জন্য এবলি যুগে যুগে প্রয়োজন

অকুণ্ঠিত চিত্তে যিনি আদর্শের জন্য নিজ সুখ-সম্পদ বলি দিবেন। পণ্ডিত মহাশয় যে আলো জ্বালিয়াছেন, এ আলো হইতে অন্য আলো যদি জ্বলিয়া না উঠে তবে বৃথাই তিনি আত্মদান করিলেন।

আমরা জানি গভর্ণমেন্ট হইতে তিনি সম্মান পাইয়াছেন। দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষও তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর সম্মিলিত অর্ঘ্যের কাছে সে রাজসম্মান নিষ্প্রভ হইয়া যায়, কারণ আমাদিগের হৃদয়শতদলের উপরেই তাঁহার আসন।

পণ্ডিত মহাশয় যশের জন্য কাড়াকাড়ি করেন নাই, কিন্তু যশ তাঁহাকে দাসের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছে।

দিনাজপুর তাঁহার জন্মভূমি নয়—কর্ম্মভূমি; জীবনের বেশী অংশ তিনি এখানেই কাটাইয়াছেন। দিনাজপুরের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল, এবং দিনাজপুরবাসীর তিনি পরম প্রেমিক ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় যখন তিনি কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য নীত হইয়াছিলেন, তখনও দিনাজপুরে তাঁহার পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিবার জন্য তাঁহার সে কি ব্যাকুলতা! সুস্থ অবস্থায় পুরীতে বেড়াইতে যাইয়াও দুদিন অপেক্ষা করিতে চান নাই। তিনি যে চক্ষে এই ম্যালেরিয়াপীড়িত দেশকে ও এদেশের অধিবাসীকে দেখিতেন আমরা যেন তাহার কণামাত্র পাই—তাহা হইলে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে।

তাঁহার 'ভুবনমোহন' নাম সার্থক হইয়াছিল। কারণ যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই বিমোহিত হইয়াছেন।

আর্য্য ঋষি শুদ্ধ সংযতমনা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্রেরই কামনা করিতেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইবেন; পরমার্থন লাভ করিবেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই ঋষি-আকাঙ্ক্ষিত পুত্রই ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেই অকুণ্ঠিতচিত্তে দ্বিধাশূন্যভাবে বলা যাইতে পারে—

'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'

তত্ত্ববোধিনী বিজ্ঞাপনী

খেয়াল—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথঠাকুর প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা মাত্র। কলিকাতা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে পাওয়া যায়।

মান্যবর জষ্টিস শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত।

"প্রীতিভাজনেষু

আপনার 'খেয়াল' পড়িলাম। ইহা শুধু যা তা খেয়াল নহে—ইহাতে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের সুমধুর সুরতরঙ্গ-ভঙ্গ প্রকটিত। বর্ণনার মাধুর্য্য, যুক্তির নৈপুণ্য, ভাষার লহরী, প্রকৃতিপূজার মহার্ঘ্য অর্ঘ্য—একাধারে ইহাতে সবই আছে। এমন খেয়াল লইয়া যদি সবাই থাকে তবে জাতি ও সাহিত্য বাঁচিয়া যায়।

একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকখানিতে মৈন্নুদ্দি কোচমান ওরফে বড়মিয়ার ছবি দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃদয়ের উচ্চতা, উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইলাম। আপনি দেশবাসীকে শিখাইয়াছেন দীনদুঃখী পুরাতন ভৃত্যকে কেমন করিয়া আদর করিতে হয়। সচরাচর দেখি ঐশ্বর্য্য দৈন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। আপনি একখানি ছবিতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া নীরব ভাষায় বুঝাইয়াছেন, সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের প্রধান উপাদান।"

"KHEYAL"—

The author's thoughts are stringed together through the stories of travel described in this book. At times there are departures from the main theme but there is a connected link throughout. The thoughts are not the youthful whims and caprices of immature age as the title may suggest but the tried and personal experience of a veteran. This explains why he could not but give expressions to his wide knowledge in the course of the stories. The writing is thought-provoking and the style is simple and nice. The get-up and printing are up-to-date.

Liberty—7. 7. 29.

ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়া তাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা ও অভিমত একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। নানা বিষয় লইয়া আলোচনা থাকিলেও সকলগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়া তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সাধারণের উপকারার্থ প্রকাশ করিলেন; এগুলি পড়িলে পাণ্ডিত্যলাভ ও শিক্ষালাভ হয়। ভাষা ও লিখনপ্রণালী চমৎকার; ছাপা ও কাগজও বেশ ভাল।

বঙ্গবাণী—২৩শে আষাঢ় ১৩৩৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩২

১৮৫১ শক
শ্রাবণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১০ অঞ্জলি—জ্যোতির্ম্ময় দেবতা।

১। এই উষাকালে তোমারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান রথে আরোহণ করিয়া অরুণতপন চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাহিরের এই জ্যোতিতে যেমন সকল পদার্থ আমাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ তোমার জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দাও। তোমার জ্ঞানে উদ্ভাসিতচিত্তে আমরা যেন আমাদের গৃহের ও সমাজের যথাকর্ত্তব্য সংস্কারসাধনে পথ দেখিতে পাই এবং তোমার প্রিয়কার্য্য বলিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই।

২। এই পবিত্র উষাকালে অরুণতপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কপিলা ও অকপিলা সকল গাভী চরিয়া তৃণশস্প খাইবার জন্য হাম্বারব করিতে করিতে মাঠে বাহির হইয়া গেল। নরনারী সকলে নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে যত জীবজন্তু যত নরনারী আছে, সকলেই জাগ্রত হইয়া তোমারই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মযজ্ঞ সফল করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

৩। উদ্যোগী ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর এবং অধর্ম্মের সহিত নিত্য সংগ্রামশীল ব্যক্তিকে যেরূপ শ্রী সহজেই আশ্রয় করে, সেইরূপ শুভকর্ম্মসাধক ও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়ত উদ্যোগশীল আমাদিগকে যথোচিত ধনরত্ন ও শ্রীসম্পদ প্রদান করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোল।

৪। উষা ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহার বিমল সৌন্দর্য্যে তোমারই সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গাভীসকল বৎসগণকে স্তন্যপান করাইতেছে এবং লেহন করিয়া তাহাদের দেহে উত্তাপ ও বল প্রদান করিতেছে। এই সকলের ভিতর দিয়া তোমারই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিতেছে। তুমি আমাদের অন্তরে তোমার সুস্নিগ্ধ বিমল মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরে আসন গ্রহণ কর এবং আমাদের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ মলিনতা তোমার করুণাবারিতে বিধৌত কর।

৫। উষাকালে অরুণভানু পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া আকাশের অন্ধকার যেমন অপসারিত করিতে

থাকে, তুমিও সেইরূপ আমাদের চিত্তগগনে সমুদিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের সকলপ্রকার সংশয় ও মলিনতার অন্ধকার ছিন্ন করিয়া দাও। ঘৃত ও ইন্ধন পাইলে যজ্ঞাগ্নি যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তোমার চরণে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, আমাদেরও জ্ঞান ও প্রেমের অগ্নি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দুহিতা যেমন পিতার চরণসেবা করিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ হয়, আমরাও যেন সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে তোমার সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হই।

৬। নিশীথের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে। জগতবাসী সকলেই নূতন প্রাণ লাভ করিয়া চারিদিকে হাসি বিকীর্ণ করিতেছে। এই নবজাগরণের সঙ্গে আমরাও যেন নব বলে নব উৎসাহে তোমার নামের মহিমা প্রচার করি এবং সকলের প্রাণ হইতে দুঃখ-বিষাদের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সুখশান্তির বিমল জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

৭। আমাদের বংশের সন্তানগণ তাহাদের সকল কার্য্যে যেন সর্ব্বপ্রথম তোমাকে সুনৃত বাক্যে রচিত স্তবস্তুতি দ্বারা আহ্বান করে, এবং তোমার আশীর্ব্বাদে তাহারা যেন জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে অর্থে মানে সকল বিষয়ে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তুমি আমাদিগকে বীর ও সুকর্ম্মা পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজনের এবং গো অশ্ব প্রভৃতির কখনও অভাব না হয়।

৮। এই বিমল প্রভাতে আমরা সূর্য্যের অন্তর্যামী পরম পুরুষ তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে যশ ও কীর্ত্তি, ধৈর্য্য ও বীর্য্য প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজন এবং যানবাহনের অভাবে না পড়িতে হয়। হে পরম সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও এবং আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্ন ও প্রচুর অন্নজল প্রদান করিয়া সুখে ও শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার প্রদান কর।

৯। উষার বিমল প্রভায় সকল গগনভুবন প্রভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। উষা তোমার নাম গান করিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। সেই আহ্বানের মধ্যে আমরা তোমারই সত্যবাণী শ্রবণ করিতেছি।

১০। এই সুবিমল প্রাতঃকালে প্রভাতপবন আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া নববল বিধান করিতেছে। গতকল্যকার ভয়ভাবনা উষার আবির্ভাবের সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! এই উষার অমৃতস্পর্শে তোমারই মাতৃহস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি। তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

১১। উষার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আমাদের অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার হিংসা বিদূরিত হৌক এবং স্নেহ প্রেম দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সাধুভাবসকল আমাদের অন্তর অধিকার করুক। উষার নিত্য নব সৌন্দর্য্যের ভিতর সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র অক্ষয় উৎস তুমিই প্রকাশিত হও এবং জীবগণকে নিত্যনব জীবনে পরিবর্দ্ধিত কর। এই উষার বিমল আলোকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হৃদয়গগন হইতে সংশয়ের অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তোমার প্রেমের আলোক আমাদের আত্মাকে তোমার সহিত একযোগে যুক্ত করিয়া দিতেছে। পতিব্রতা পত্নীর সেবাশুশ্রূষায় যেমন তাহার স্বামী শীঘ্র সবল হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ স্তবস্তুতি দ্বারা তোমার নাম ও মহিমা মহীয়ান হইয়া উঠুক।

১২। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাখাল যেমন গাভীসকলকে সুন্দর তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিচালিত করে, তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত কর এবং আমাদিগকে তেজস্বী ও সৌভাগ্যবান কর, যাহাতে আমরা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সকল সময়ে বিজয় লাভ করিতে পারি। শত সূর্য্যের জ্যোতিতে তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও।

১৩। উষার আলোকে আমরা জাগ্রত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই এবং বহুবিধ ধনরত্ন আহরণের প্রয়াস পাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে যেন কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে না হয়।

১৪। উষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের বাসগৃহের এবং গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতির

সকল অংশই সুমার্জ্জিত করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহের লোকসকলকে এবং গোশালার গাভীগণকে ও অশ্বশালার অশ্বদিগকে সুস্থ ও সবল কর, যাহাতে তাহারা ধনরত্ন আহরণার্থ অনুষ্ঠিত আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায়তা করিতে পারে।

১৫। আমরা যেন কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ না করি। আমাদের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইয়া শত্রুমিত্র সকলেই যেন আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায় হইয়া সৌভাগ্য আনয়ন করে।

১৬। উষা যেমন অরুণ-অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, আমরাও সেইরূপ তোমার নাম লইয়া আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বহন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছি। আমরা যেন আমাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৭। হে জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ! তোমারই আদেশে উষার আবির্ভাবে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ সকলই আলোকে আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অন্তরও তোমার সুবিমল আলোকে প্রকাশিত হইয়া উঠুক। তোমার সত্য তত্ত্ব সকল আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

১৮। এই পবিত্র উষাকালের আলোক ও বায়ু তোমারই পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বাস্থ্য বিতরণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। আমরা যেন সেই আলোক ও বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভ করি। আমরা যাহা কিছু আহার করিব ও যাহা কিছু পান করিব, সে সমস্তই আমাদিগকে মহাকায় হস্তীর উপযুক্ত বল ও বীর্য্য প্রদান করুক। আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী কর; আমাদিগকে নানাবিধ জ্ঞানে ও গুণে বিভূষিত কর; আমাদিগকে তোমার চরণতলে বসিবার উপযুক্ত করিয়া লও।

দেবমন্দিরে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্মুখে একটী প্রাচীন—বহুপ্রাচীন দেবমন্দির অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে। কি সুন্দর ইহার কারুকার্য্য! অনেক স্থলে কারুকার্য্য খসিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই তো মুগ্ধ হইতে হয়—তাহা হইতে চক্ষুকে তো উঠাইতে পারা যায় না। যে ভক্ত নিজের প্রাণ দিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাহার পর একপুরুষ-একপুরুষ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে যে কত পুরুষের আবির্ভাব হইল, আর কত পুরুষ যে অনন্ত কালের অতল গর্ভে নিলীন হইয়া গেল, কে-ই বা তাহার সম্বাদ রাখে? এই দেবমন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে পুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া কত জননী কত দীর্ঘকাল ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিলেন; ভ্রাতার দুঃখকষ্টে আকুল হইয়া কত ভগিনী এই দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার চরণে দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; জরাজীর্ণ রোগে মৃতপ্রায় পিতামাতার সুস্থ জীবন ফিরিয়া আনিবার আশায় কত কন্যা আঙ্গুল মটকাইয়া মাথা খুঁড়িয়া দরদরধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—কে-ই বা সে সমস্তের খোঁজ খবর রাখিয়াছে? আর কে-ই বা জানে, তাহাদের মধ্যে কে বা প্রার্থনার সাড়া পাইয়াছিল, আর কে বা পায় নাই। কিন্তু ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এই মন্দিরে সমাগত ঐ সকল প্রার্থীগণের সকলেরই অন্তরে এই একটী মহান প্রশ্ন তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি?

আজ পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি এই দেবমন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং আশ্রয়স্থানের অভাবে আকুলভাবে ফিরিয়া যাইতেছে। বুঝি বা সেই প্রতিধ্বনিরও একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঐ প্রশ্ন আমার প্রাণে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি? এক সময়ে পূজকদিগের প্রার্থনার গভীরতায়, ভক্তদিগের শ্রদ্ধাভক্তির প্রাবল্যে মন্দিরের অন্তর গাম্ভীর্য্যে মূর্ত্তিমান ও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—কোথায় বা কে? ভক্তিশ্রদ্ধার গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে শোকের করাল মূর্ত্তি যেন মৃত্যুর লোলজিহ্বা বাহির করিয়া আগন্তুকদিগকে গ্রাস করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। আমার আত্মা কিন্তু

এই মৃত্যুর মাঝে দাঁড়াইয়া অমৃতের সন্ধানে শবসাধনায় বসিবার জন্য অবসর খুঁজিতেছে, এবং মুহূর্মুহু ঐ একই প্রশ্ন করিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি ?

মন্দিরটীর দ্বাদশ "রত্ন"। সুবর্ণখচিত দ্বাদশটী রত্ন-চূড়া ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। কে জানে ?—হয়তো ভক্ত এই দ্বাদশ রত্নে মন্দিরটীকে সুশোভিত করিবার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া পরিণামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকেও আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেও ঐ দ্বাদশ রত্ন গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়খানি নিশ্চয়ই সুবর্ণের রঙ্গে রাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই অতীত কালে গিয়া ঐ ভক্তের নিকট একবার উপস্থিত হইয়া জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতর এই প্রশ্নের সমাধান পাইয়াছিলেন কি না—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

আমার মৃতপ্রায় আত্মা এবং এই জীর্ণদেহের ভগ্নতরী লইয়া আজ এই প্রাচীন দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এখানে কে এমন আছে, যে আমার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিয়া নূতন বল ও নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে পারে ? তেমন কাহাকেও তো এখানে দেখি না। আমি যে দেবতার সন্ধানে বাহির হইয়াছি, দিবানিশি যাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছি, চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে, সে দেবতা এখানে কোথায় ? যাঁহার চরণের রেণুকণার স্পর্শে পঙ্গু যে, সেও গিরিলঙ্ঘনে সক্ষম হয় এবং মূক যে, সেও বাগ্মিতা লাভ করে, সে দেবতা এখানে কোথায় ? যাঁহার কৃপা লাভ করিলে দুর্ব্বল সবল হয়, অনাথ সনাথ হয়, এবং মৃত ব্যক্তিও নবজীবন লাভ করিয়া নববলে ও নবশক্তিতে জাগ্রত হয়, সে দেবতা এখানে কোথায় ? বুঝি, তিনি এই মন্দিরের ক্ষুদ্র সীমা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—যাদুযষ্টিহস্তে এমন কাহাকেও তো এখানে দেখিতেছি না, যিনি দেবতার মৃত-সঞ্জীবন স্পর্শ অনুভব করাইতে পারিবেন। স্বামীর জীবদ্দশায় যে গৃহলক্ষ্মী গৃহের সকল স্থানে ও সকল কর্ম্মে স্বীয় মোহন স্পর্শে শ্রী ও সুষমা আনয়ন করেন ; আবার সেই গৃহলক্ষ্মীই স্বামীর বিরহে শুষ্ক সুগন্ধ পুষ্পের ন্যায় ম্লান হইয়া পড়েন—তখন তাঁহার সেই শ্রী ও সুষমা আনিবার মত সে স্পর্শ কোথায় ? যে ভক্ত নিজের প্রাণের বিনিময়ে এই জড় মন্দিরেও প্রাণ আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিরহে সেই দেবমন্দির অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া চলিয়াছে—ইহার প্রকৃত প্রাণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে দেবতা ইহার প্রাণ ছিলেন, আজ তিনি কোথায় ? মনে হয় যেন, ভক্তেরা ঐ প্রশ্ন লইয়া এখানে আসেন বটে,—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি—কিন্তু উত্তরে সেই দেবতার সন্ধান না পাইয়া হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া যান।

এই দেবমন্দির কত ভক্তের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে ; আবার এই দেব-মন্দিরই কত অজ্ঞান ও মূঢ় ব্যক্তির কত অনাচার কদাচারের ও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অপরের কত অনিষ্ট অমঙ্গল চিন্তারও সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান! বুঝি, ইহারাই এই দেবমন্দিরের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছে ; ইহাদেরই অত্যাচারে ও ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হইয়া যিনি ইহার প্রাণের উৎস খুলিয়া দিবেন, যাঁহার অমৃতধারা লাভ করিয়া ইহা অমরত্ব লাভ করিবে, সেই অমৃতপুরুষকে লইয়া সাধুভক্তগণ হিমালয়ের নাকি কোন্ পাদদেশে, কোন্ এক নির্ঝরিণীর উপকূলে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে হয় যেন, সেই সাধুদিগের অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া এই দেবমন্দির প্রাণের ব্যথায় দিবানিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, নিজের জ্বালায় নিজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

এই দেবমন্দির বলিতে গেলে এখন শ্মশানে পরিণত। এই শ্মশানে এখনও কত শত লোক দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়—কে জানে কেন ? তাহাদের প্রাণের কি আকুল আকাঙ্ক্ষা—তাহারা আসে প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য, কিন্তু ফিরিয়া যায় ব্যর্থতার উপলখণ্ড লইয়া। তাহারা সন্ধানে আসে—কোন্ দেবতার পদে দিবে তারা হবি ; ফিরিয়া যায় জড়ের চরণে আত্মবলি দিবার উপদেশ পাইয়া। জীবন-প্রদ অমৃতসলিলের অভাবে, প্রাণপ্রদ শক্তিদান করিবার ক্ষমতার অভাবে এই দেবমন্দিরের মত কত শত দেব-মন্দির জরাজীর্ণ হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে ?

সেই সকল মন্দিরের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও উহাদিগের ধ্বংসের পথে শ্মশানের পথে অগ্রসর হওয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া পৃথিবীর যতই কেন ভাল বস্তু হোক না, তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া অন্তরে বিষাদের আগুন ধকধক জ্বলিতে থাকে। হায়! এই মন্দিরের কারুকার্য্যসকল বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ইহার নির্ম্মাতা অকাতরে কত সময়, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জরার করাল কবল হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইল না। মন্দিরের প্রাণ যিনি, সেই আসল দেবতার অভাবে এ সমস্তেরই ব্যর্থতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে কাতরতা প্রকাশ করিতে সমুদ্যত! যাঁহার অন্বেষণে সমস্ত জগতবাসী ধাবিত হইতেছে ; সমস্ত জগতের প্রাণ হইতে যাঁহাকে পাইবার

জন্য সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি ; সমস্ত বিশ্বজগত যাঁহার অচল অটুট মন্দির, সেই দেবতার স্থান এ মন্দিরে কোথায় ? তাঁহার স্থান যদি এই মন্দিরে এবং ইহার মত অন্যান্য সকল মন্দিরে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস নিশ্চয়ই নবতর ভাবে লিখিত হইত ; জগতের ইতিহাস অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অন্যায় অত্যাচারের রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইবার পরিবর্ত্তে ন্যায় ও ধর্ম্মের এবং শান্তি ও অহিংসার বিশুভ্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইত নিঃসন্দেহ।

এই প্রাচীন দেবমন্দিরকে বিনা বার্দ্ধক্যেই জরা আসিয়া অধিকার করিয়াছে, তবু এখানে যাত্রীসমাগমের বিরাম নাই—অগণিত যাত্রী ইহাকে অমৃতধাম বিশ্বাস করিয়া দিনরাত্রি আসিতেছে আর যাইতেছে। মন্দির হইতে যে প্রসাদ বিতরিত হইতেছে, তাহা উহারা পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মাথায় তুলিয়া লইতেছে। কিন্তু প্রসাদ বলিয়া যাহা বিতরিত হইতেছে, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক কল্যাণের কোনও স্পর্শ আছে বলিয়া অথবা সত্যের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া দেখি না। যে দেবতার আসন সমস্ত বিশ্বজগত জুড়িয়া পাতা আছে, যিনি সর্ব্বকালে ও সকল স্থানে সমভাবে জাগ্রত এবং যাঁহাকে গাঢ়তর অনুভবের মধ্যে আনিবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া পড়িয়াছি, সে দেবতা যে এই মন্দিরে স্থাপিত দেবতা নন, এবং এই প্রসাদ যে তাঁহার প্রসাদ নয়, তাহার প্রমাণ দেখি যে, এই মন্দিরের ঐ ক্ষুদ্র দেবতাকে অধিকাংশ সময়ই ঢাকিয়া রাখা হয়—যেন জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবে! মশামাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দিনের বেলায় যাহাতে তাঁহার সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে মশারি খাটাইয়া ঘিরিয়া রাখা হয়!! সমস্ত মন্দিরটী এমনভাবে বিরচিত যে, তাহার অন্তর্নিহিত অন্ধকারে ইন্দুর বাদুড় প্রভৃতি জীবজন্তু অনায়াসে আশ্রয় পায়,—আশ্রয় পায় না কেবল মানুষ!

প্রসাদ যাত্রীগণকে বিতরণ করা হয়, কারণ মন্দির-নির্ম্মাতা ভক্তের হৃদয় এই উদ্দেশ্যে বহুপরিমাণে দেবোত্তর জমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন ; তদ্ব্যতীত আরও কতশত ভক্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির পর উচ্ছ্বসিত ভক্তির নিদর্শনরূপে আরও কত কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত দানের সঙ্গে ভগবানের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজিয়া পাই না। এই নির্জীব জড় বস্তুর পূজার সঙ্গে মিশর দেশে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত মৃত রাজারাণীর শবদেহের পূজার তুলনা দিতে বাধা কি ? বিশ্বজগত যাঁহাকে কোন্ দেবতা কোন্ দেবতা করিয়া অন্বেষণ করিয়া ভূধর সাগর গিরিকন্দর সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, এই মন্দিরের মধ্যে সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে প্রকৃত প্রাণ আসিবে বলিয়া মনে হয় না। একই দেবতা—যিনি অনাদি অতীতে ছিলেন, যিনি বর্ত্তমানে আছেন এবং যিনি অনন্ত ভবিষ্যতে থাকিবেন, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তিনিই নব নব আকারে প্রকারে, নব নব শক্তিতে ভাবেতে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা উপলব্ধি কর, দেখিবে—কি মন্দিরের অভ্যন্তরে, কি উহার বহিঃপ্রাঙ্গনে, অন্ধকার কিছুমাত্র থাকিবে না—সমস্ত অন্ধকার এক অপূর্ব্ব আলোকে ঝলসিয়া উঠিবে। ঐ প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। অন্তরে নূতন জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, প্রীতির নবতর প্রশস্ত পথে চলিতে থাক এবং আধ্যাত্মিকতার শিখরদেশে আরোহণ কর, তবেই মৃতধর্ম্মের কঙ্কাল জড়পূজা ও ভগবৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্ম, উভয়ের পার্থক্য তোমার সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

বিজ্ঞান যখন এক একটী জগতকে দাঁড়িপাল্লার ওজনেও ফেলিবার জন্য সদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিতেছে এবং ভূগর্ভ হইতে অতীতের ইতিহাস নিষ্কাশিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না ; প্রজ্ঞান যখন আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়া মানুষকে স্তম্ভিত করিতেছে, তখন যে নামেই হোক, জড়-পূজার সাহায্যে পরাধীনতার যন্ত্রতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিলে তাহা আত্মহত্যার অতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না। অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহাকে অন্বেষণ কর—যিনি জলে স্থলে শূন্যে সমভাবে বিদ্যমান ; অচিরে তিনি সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন।

মন্দিরে আর পবিত্রতা নাই। এখন সেখানে দস্যুগিরির প্রাদুর্ভাব। এখন সেখানে জাগিয়া আছে—অর্থের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ফেল কড়ি, আর প্রতি পদ নিক্ষেপ কর। অর্থের অতিমাত্র আকাংক্ষার নিকট পবিত্রতা প্রভৃতি শতবিধ সদ্ভাব দূরে পলায়ন করে। কিন্তু পরাধীনতা মানুষকে কি প্রকার আশ্চর্য্য রূপ অবশ করিয়া রাখে—ভিক্ষার ঝুলি খোলা রাখিয়া দস্যুগিরি চলিতেছে প্রত্যক্ষ করিলেও ভিক্ষাদাতাগণ বৃথা দানেও পুণ্যকর্ম্ম করিল ভাবিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে! যাহা কিছু দান কর, সে সমস্ত কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা কে জানে ? মন্দিরের সিঁড়ি প্রভৃতি যে সকল অংশ সাধারণের বহির্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ হইবে, সেইগুলির যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার হইলেই হইল ; আগন্তুকদিগের অন্তর কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে,

সেদিকে কোনই লক্ষ্য নাই। যাত্রীদিগের আনাহার কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেদিকে কাহারও কোনও লক্ষ্যই নাই। তাহাদের অন্তরে পরাধীনতাজনিত দাস-মনোভাব এতই বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কৃমিপূর্ণ জলাশয়কেও পবিত্রতার পরম আধার বলিয়া মনে করে ও তাহার জলকে তদনুরূপ ব্যবহার করে। এই মন্দিরে মনের স্বাস্থ্যপ্রদ জ্ঞানশিক্ষাকে স্থান পাইতে দেখি না; প্রত্যুত যাত্রীদিগকে পরাধীনতার পরিপোষক সর্ব্ববিধ শিক্ষা দিবারই অনুকূল ব্যবস্থা করা হয়। কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি, এই যে প্রশ্ন লইয়া আমি আজ এই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মন্দিরের চারিভিতের মধ্যে, কৈ, তাঁহার সন্ধান পাইবার উপযুক্ত কোনও শিক্ষা দিবারই তো ব্যবস্থা দেখি না; প্রত্যুত, জড়পূজার শিক্ষা দিয়া মানুষকে জড়ে পরিণত করিবার ব্যবস্থাই তো সর্ব্বত্র দেখি।

আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—মন্দিরে নহে, মন্দিরের বাহিরে; মন্দিরের চারিভিতের ক্ষুদ্র সীমার ভিতরে নহে, কিন্তু বিরাট বিশাল প্রকৃতির সীমাহীন সীমার মধ্যে। আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জড়মূর্ত্তি সন্দর্শনে নহে, কিন্তু আত্মার হিরণ্ময় আসনে অধিষ্ঠিত জীবন্ত জাগ্রত দেবতার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া। যে দেবতার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি বাহিরের ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবার ফলে নহে, কিন্তু অকিঞ্চনগুরু প্রাণের দেবতার স্নেহপ্রেমের ভিক্ষাদানে আমার নিজের আত্মার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিবার ফলে।

প্রশ্ন—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আমি পূজি দিয়া হবি?

উত্তর—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥
অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি;
জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি;
ওষধি বনস্পতি ভুবন ভরিয়া যিনি—
তাঁহারে ভক্তিভরে নমি নমি নমি সদা নমি,
নমি নমি সদা নমি—নমি নমি সদা নমি॥

রংপুরে রামমোহন রায়।

(২)

[সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে]

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামমোহনের উপর ডিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

"আমি আপনার ১৫ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে এমন অনুকূল মন্তব্য-প্রকাশ এবং তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সত্ত্বেও বোর্ড মৎকর্ত্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি করিলেন।

"আপনার পত্রের প্রথমাংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান পদ সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদের কর্ত্তব্যসম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে যখন আমি কাজ করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুন্সীরূপে কার্য্য করিবার কালে তিনি রাজস্ব-আদায়ের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে। আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সরকারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর দেওয়ান পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

"আমি যে লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্-কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুন্সী এবং ঐ সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।

"তাঁহার গুণ ও যোগ্যতা ভালরূপে জানি বলিয়া, যে কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি সে কাজ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া দেশীয়দিগের চক্ষে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে আমার মনে আঘাত লাগে। আমি তাঁহাকে অস্থায়িভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এই আশায় যে, যাঁহাদের নিকট সন্ধান লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছি সেই দেশীয়গণ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জানাইবেন সেই ধারণা এবং কাজকর্ম্মে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া জানাইয়াছি সেই জ্ঞান, আমার আপিসের দেওয়ানের পদ-নিয়োগ-সমর্থনে বোর্ডকে প্ররোচিত করিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি এই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

"জামিন সম্বন্ধে বোর্ডকে এই কথা জানাইতে চাই

যে, তিনি অন্যান্য জেলা হইতে যত টাকা হোক জামিন জোগাড় করিতে পারেন।" (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০) *

১৮০৭, ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী অস্থায়ীভাবে যশোহর জেলার কালেক্টরের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। † এই পদে তিনি ছয়মাস কাল—১৮০৮, ৯ই জুন পর্য্যন্ত ছিলেন। ‡ সুতরাং এই সময়েই রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী মুনশীরূপে যশোহরে অবস্থান করেন। যশোহর ত্যাগ করিয়া, ডিগবী রেজিষ্টারের পদে ভাগলপুর গমন করেন। রামমোহনও যে এই সময় (১৮০৯) ভাগলপুরে ছিলেন, সরকারী কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ভাগলপুরেও রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অধীন বাঙালী কর্ম্মচারীর অনুকূলে ইংরেজ সিবিলিয়ানের এরূপ উচ্চগুণগান বড় সুলভ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিলেন না, অধিকন্তু চটিয়া কালেক্টর ডিগবীকে কড়া চিঠি লিখিলেন,—

"আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত মাসের ৩১শে তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, আপনার পত্রে এমন কোন কারণ দেওয়া আছে বলিয়া বোর্ড মনে করেন না যাহার জন্য আপনার জেলার দেওয়ান-পদে রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বোর্ড তাঁহাদের পূর্ব্বমত বদল করা আবশ্যক মনে করেন; এই হেতু তাঁহারা ইচ্ছা করেন, আপনি তাঁহাদের গত মাসের ১৫ই তারিখের চিঠি অনুযায়ী ঐ পদের জন্য অপর কাহাকেও মনোনীত করিবার চেষ্টা দেখুন।

"বোর্ডের ইচ্ছামত আপনাকে আরও জানাইতেছি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভঙ্গীতে পত্র লিখিয়াছেন বোর্ড তাহা অত্যন্ত অপছন্দ করেন; তাঁহাদের প্রতি পুনরায় এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, বোর্ড যে তাহা অত্যন্ত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।" (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১০) §

বোর্ডের নিকট ডিগবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু তবুও তিনি শেষবার রামমোহনের নিয়োগের জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন রামমোহনকে কাজ করিতে দিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন:—

"এই জেলার দেওয়ান-পদে মৎকর্তৃক রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সম্পর্কিত এবং গত ৩১শে জানুয়ারী লিখিত আমার চিঠির লিখন-ভঙ্গীর প্রতি বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর বিরক্তি-প্রকাশক, আপনার গত মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

"যাহার নাম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করিয়াছিলাম, তাঁহার উচ্চাঙ্গের প্রতিভা, বিচার-শক্তি এবং চরিত্রবলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানের গভীরতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা হেতু আমার আপিস-সংক্রান্ত কাজে জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন বোর্ড সেইরূপ ব্যক্তির নিয়োগ নামঞ্জুর করাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই আমার মন্তব্যে যদি এমন-কিছু তীব্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে—যাহা অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার অনবধানতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। জানিয়া-শুনিয়া অসম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা দূরে থাকুক, এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের প্রত্যাখ্যানে সম্মান-সহকারেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম এবং বোর্ড বাতিলের যে-সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই-সকল কারণ বেশী করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও রামমোহন রায় অপেক্ষা অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগও যে মঞ্জুর করা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নজির আছে তাহাও বোর্ডকে মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, আমি প্রার্থনা করি আপনি একথা বোর্ডকে বুঝাইয়া বলিবেন।

"দেওয়ানের কাজে একজন সুদক্ষ লোককে নিযুক্ত করাই বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যও আমার ইচ্ছার অনুরূপ। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে অভ্যাস নাই বলিয়া যখন অনুমান-বলে ধরিয়াই লওয়া হইতেছে যে, আমার মনোনীত লোকটি রাজস্ব-আদায় ব্যাপারের সাধারণ পদ্ধতিতে অজ্ঞ, তখন আমি প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বোর্ডের নিকট আমার এই একান্ত আশা জানাইবেন যে তাঁহারা যেন রামমোহন রায়কে আরও কয়েক মাস দেওয়ানের কার্য্য করিতে দিবার অনুমতি আমাকে দেন; তাহা হইলে বোর্ড তাঁহার প্রকৃত গুণপনা ও দেওয়ান-পদে তাঁহাকে বাহাল রাখার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন; যদিও আমি নিজে আশা করি যে, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসের তৌজী ও রিপোর্টগুলি দেখিয়া (এ কয় মাসে অতি অল্পই খাজনা বাকি পড়িয়াছে) বোর্ড

* Board of Revenue Con. 8 Feby. 1810 No. 9.

† Board of Revenue Procdgs 29 Dec, 1807. No. 93.

‡ Ibid., 14 June 1808. No. 34.

§ Board of Revenue Con. 8 Feb. 1810, No. 10.

তাঁহার গুণ ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকিবেন।" (৮ই মার্চ্চ, ১৮১০)*

এবারও বোর্ড ডিগবীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কালেক্টরকে লেখা হইল,—

"আপনার এই মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং আমাকে জানাইতে বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার ৩১শে জানুয়ারী তারিখের পত্রের ভঙ্গী সম্বন্ধে যে জবাব-দিহি করিয়াছেন, তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আপনার কালেক্টরীতে যে দেওয়ান-পদ খালি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ১৫ই জানুয়ারী ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত বোর্ডের আদেশ, সঙ্গতি বা ঔচিত্যবোধের দিক দিয়া দেখিলে বোর্ড বদল করিতে পারেন না—ইহার জন্য তাঁহারা দুঃখিত, এবং আপনি যেন রাম-মোহন রায় ছাড়া অপর কাহাকেও ঐ পদে মনোনীত করেন,—বোর্ডের এই ইচ্ছা আপনাকে জানাইবার জন্য পুনরায় আমাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"বোর্ড মনে করেন, ঠিক সময়ে সরকারী রাজস্ব-আদায়কার্য্য সাধারণতঃ কালেক্টরেরই প্রযত্ন প্রমাণ করে—যদিও সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও অস্বীকার করিতে চাহেন না যে, হয়ত সেই কৃতিত্বের কতকাংশ সতর্কতা ও মনোযোগিতার জন্য দেওয়ানেরই প্রাপ্য। কিন্তু বছরের তিন মাস বা তাহার অধিক কালের অনুকূল তৌজীগুলিই শুধু ঐ পদাভিষিক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিভার অথবা সাধুতার বিচারে মানদণ্ডস্বরূপ ধরিতে হইবে,—এরূপ যুক্তি বোর্ড কখনই মানিয়া লইতে পারেন না।" (১৬ই মার্চ্চ, ১৮১০)†

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে বোর্ডকে জানাইলেন,—

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে আপাততঃ অস্থায়ি-ভাবে এই আপিসের দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি। লোকটি সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র, রংপুরের ফৌজদারী আদালতে বারো বৎসর, এবং দেওয়ানী আদালতে প্রায় দুই বৎসর শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছেন। আশা করি, বোর্ড এই ব্যবস্থা সানন্দে মঞ্জুর করিবেন।" (২৮শে মার্চ্চ, ১৮১১)‡

এবার বোর্ড ডিগবীর কথায় কর্ণপাত করিলেন। ১৮১১, ১৯শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তাঁহারা মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে দেওয়ান-পদে পাকা করিলেন।

রামমোহনের দেওয়ানী লইয়া কালেক্টর ডিগবী ও বোর্ডের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়িভাবে এই পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়শত টাকার বেশী ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় লোকও বোর্ডের চক্ষে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।

ঢাকা, রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও রংপুরে সিবিলিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের যে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন চার্টার প্রাপ্তির সময় তিনি ১৮৩১-৩২ সালে হাউস-অফ-কমন্স সভায় ভারতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রংপুরে অবস্থান কালে রামমোহন নিজ বাসায় সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব লইয়া ধর্ম্মতত্ত্বের—প্রধানতঃ পৌত্ত-লিকতার অসারতার কথা—আলোচনা করিতেন। রংপুরে তখন বহুলোকের বসতি; বাসিন্দাদের মধ্যে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী মারওয়াড়ী-ব্যবসায়ীও কম ছিল না। তাহাদের অনেকেই এই সান্ধ্য-সভায় যোগ দিত। এই কারণে রামমোহনকে কল্পসূত্র ও অন্যান্য জৈনধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই একদল লোক রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নেতা—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন রংপুর জজ কোর্টের দেওয়ান, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। "ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি বাংলা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাংলা ১২৪৫ সালে (১৮৩৮) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে ফার্সী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"*

* Board of Revenue Con, 16 March 1810. No. 11.

† Ibid. No. 12.

‡ Board of Revenue Con, 19 April 1811 No. 18.

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৩১

১৮১৪ সালের শেষাশেষি ডিগবী সাহেব কিছুদিনের ছুটিতে বিলাত গমন করিলেন। ঐ বৎসরে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

——

ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান সত্ত্বস্যৈবঃ প্রবর্ত্তকঃ—ভগবান সত্ত্ব বা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সতের ভাব হইল সত্ত্ব। সৎ বলিতে যাহা আছে তাহাকেই বুঝায়; যাহা নাই তাহাই অসৎ। আবার, সৎ বলিতে যাহা সাধু যাহা ভাল তাহাকেও বুঝায়; সত্ত্ব বলিতে সাধুতাও বুঝায়। সত্ত্ব অর্থে ধর্ম্মও বুঝায়। ধর্ম্ম অর্থে যাহা ধারণ করে; বিশ্ব যাহা দ্বারা বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম। কাজেই দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভাষায় অথবা হিন্দুশাস্ত্রের ভাবার্থে ধর্ম্ম ও সাধুতা একই অর্থবাচক; এই সাধুতাই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এবং এই সাধুতারই একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

প্রকৃত যাহা আছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং তাহাই ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহার বিপরীতে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই মিথ্যা, তাহাই অশুভ এবং তাহাই অধর্ম্মের উপকরণ। অধর্ম্ম জগতকে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে বিধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। ন্যায়বিচারের যথার্থ অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রকৃত সত্যকেই দাঁড় করাইতে চায়; সেই কারণে সকলেই ন্যায়বিচারই প্রার্থনা করে, সকলে ন্যায়বিচারেরই জয়জয়কার করে। ন্যায়বিচারই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে। অন্যায় বিচারের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই। ন্যায়বিচারের অভাবই হইল অন্যায় বিচার। প্রকৃতির নিয়ম হইল ন্যায়বিচার। তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় অন্যায় বিচার; তাই কেহই অন্যায় বিচার প্রার্থনা করে না। সকলেই জানে যে, উহা ধর্ম্ম নহে, উহা জগতকে ধারণ করিতে পারে না—প্রত্যুত, উহা জগতকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে চায়।

এই প্রকার আরও অনেক শুভজনক চিন্তা, ভাব ও কর্ম্ম আছে, যাহার প্রতি জগতবাসী আগ্রহশীল হয়, যে গুলিকে জগতবাসী ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে একপ্রকার বাধ্য হয়। এই যে বিভিন্ন বিষয়কে বিভিন্ন জগতবাসী আমরা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতেছি, ইহাই তো ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেরই প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। তিনিই এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই তাঁহার ধর্ম্মের দ্বারা এই জগতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও পালন করিতেছেন। তাঁহারই অচ্ছেদ্য নিয়মে তিনি এই জগতসংসারকে মঙ্গলভাবে পরিচালিত করিতেছেন। আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি বা নাই পারি, এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সে সমস্তই তাঁহার ন্যায়বিচারে, তাঁহার ধর্ম্মনিয়মে বাঁধা—কোনও ঘটনাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তিনিই আমাদের পরম আশ্রয়স্থান, তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। যে কোন সীমাবদ্ধ প্রাণীর উপরে নির্ভর কর, কোন-না-কোন সময়ে সেই নির্ভর টলিলেও টলিতে পারে; কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিলে তাহা কিছুতেই টলিতে পারে না, কারণ তিনি তাঁহার নিজের সত্যধর্ম্মে বাঁধা। যাঁহার ধর্ম্ম অটল; যাঁহার ধর্ম্ম ধরিয়া চলিলে আমরা জানি যে, মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল আসিতে পারে না; যাঁহার ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিলে আমরা নির্ভয় হই, শান্তি পাই, সেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে আমাদের প্রকৃত নির্ভরস্থল আর কোথায়? পিতামাতার উপর সন্তান নির্ভর করে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। পিতামাতাও সন্তানকে তাঁহাদের স্নেহ দান করিয়া কৃতার্থ হন। এই যে লক্ষ কোটী জীবের নির্ভর ও বিশ্বাস, এই যে লক্ষকোটী জীবের স্নেহপ্রেম,—এসকল আসে কোথা হইতে? এগুলি তো তুমি আমি জগতে আনয়ন করি নাই, বরঞ্চ এগুলি পাইবার জন্য, সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য আমরা একান্ত উৎসুক হইয়া থাকি। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি এবং অন্তরে দৃষ্টি করিলে সেখানে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে নিহিত দেখি যে, এসকলের মূল উৎসরূপে এক অখণ্ড ভগবান বিদ্যমান। আরও দেখি যে, এই নির্ভর ও স্নেহের অস্তিত্বে, ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদানে সংসার মধুময় হয়, সংসারে মঙ্গল শতধারে উচ্ছসিত হইয়া উঠে।

অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্যের ধারা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে ও তাঁহার মঙ্গলভাবে যদি এতটুকু সংশয় তোমার অন্তরে সমুদিত হয়, তবে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তাঁহার সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার অধিকারও আমাদের নাই, আর অবসরও নাই। আমাদের জ্ঞানই বা কতটুকু, আর আমাদের শক্তিসামর্থ্যই বা কতটুকু? এই যে আমাদের পরমায়ু, নিরবধি কালের সঙ্গে যখন ইহার তুলনা করিতে যাই, তখন সেই কালের বিশালতা এবং আমাদের পরমায়ুর ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই যে আমাদের জ্ঞান, যাহার বড়াই করিয়া আমরা ভগবানের প্রতি সংশয় পোষণের স্পর্দ্ধা প্রদর্শনে সাহস করি, সেই জ্ঞানই বা আমাদের কতটুকু? একটীমাত্র বালুকণার তত্ত্বসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কারে এক

জীবনে তো কুলাইবে না, কত জীবন যে লাগিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না; আর এই জ্ঞানেও কুলাইবে না—আশ্চর্য্য, একটী একটী করিয়া যতই তত্ত্ব আবিষ্কার করি, আরও কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সম্মুখে বাকী পড়িয়া আছে উপলব্ধি করি।

আমাদের শক্তিই বা কতটুকু—সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনও একটাকেই কি তাহার কক্ষপথ হইতে এক কেশাগ্রও বিচ্যুত করিতে পারি? সকল বিষয়েই যখন ক্ষুদ্রতার শতবিধ সীমা আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, তখন বিশ্বপতি বিশ্ববিধাতা ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় করিবার স্পর্দ্ধার অবসর কোথায়? যেটুকু শক্তিও আমরা পাইয়াছি, যেটুকু জ্ঞানই বা আমরা পাইয়াছি, এগুলি কেহই তো বাহির হইতে আসিয়া আমাদের অন্তরে বসাইয়া দেয় নাই। এই যে কোটী কোটী জননীর অন্তরে কোটী কোটী সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্বীয় জীবনেরও বিনিময়ে প্রাণের আকাংক্ষা নিহিত দেখি, সমস্ত মঙ্গলভাবের এক অখণ্ড উৎস, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অদ্বিতীয় নির্ঝর এক ভগবান ব্যতীত আর কে ইহা নিহিত করিতে পারেন? তিনিই যখন সমস্ত জগতের একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই যখন সমস্ত বিশ্বজগতের একমাত্র বিধাতা, তিনিই যখন সমস্ত মঙ্গলভাবের, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অখণ্ড উৎস, তখন তাঁহার সকল বিধান আমরা বুঝি বা না বুঝি, তাঁহার অস্তিত্বে বা তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় দেখাইবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শনের কোনও অধিকারও আমাদের নাই, অবসরও নাই।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই তাঁহার ন্যায়বিচারও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার শক্তির কোনও দিকে কোনও সীমা থাকিলে তাঁহার ন্যায়বিচারে আঘাত পড়িবারও সম্ভাবনা থাকিত। আমরা দেখিতেছি, বিশ্বজগত উন্নতির অভিমুখে ধাবমান। সমগ্র জগতের অধিবাসী ন্যায় ধর্ম্ম সত্য দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ অবলম্বন করিবার জন্যই আকুল। এ অবস্থায় তাঁহার প্রতি, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের প্রতি সংশয় করিয়া আপনাকে বিনাশের মুখে, মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতে দিও না। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া, বলক্রিয়া, সমস্তই স্বাভাবিক, সকলই আশ্চর্য্য। তাঁহারই ইঙ্গিতে এই প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিচার করিতে গেলে আমাদিগকেও প্রকৃতির অতীত হইতে হইবে!—ইহা অসম্ভব। তিনিই আমাদের ঈশ্বর। ন্যায় সত্য প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সদ্‌গুণ আছে, তাঁহার চরণ স্পর্শ লাভ করিবার সেই সমস্ত সদ্‌গুণই এক একটী সুপ্রশস্ত পথ। তিনিই রাজগণ-রাজা। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিবার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম ও তাহার অনুকুল নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর—অবিলম্বে স্বাধীনতা হস্তগত হইবে।

তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, তিনিই আমাদের স্নেহময়ী মাতা। তিনি কেবল ন্যায়বিচারের তৌলদণ্ড হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া নাই। আমরা যখন দুঃখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ-আপদের মর্ম্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া দুই মুহূর্ত্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুল-প্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া লয় না, অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসে না। তাঁহার করুণা, তাঁহার স্নেহপ্রেম, পদে পদে তাঁহার দয়ার পরিচয় যে অনুভব করিয়াছে, সে যে তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হয়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিয়াছেন; আমরা আপনাদিগকে সেই অমৃত পুরুষের সন্তান অমরণধর্ম্মা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়েই উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী বলিয়া জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের অধিকতর পরিচয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের চারিদিকে মৃত্যু ও তাহার অনুচরবর্গ সর্ব্বদাই সগর্ব্ব পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। আমরা অনেক বিষয়ে ফাঁকি দিয়া চলিলেও চলিতে পারি, কিন্তু মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা আমাদের কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই কারণেই আমাদের চিত্ত মৃত্যুর বিভীষিকায় নিতান্তই বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মৃত্যুকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত্যু যাঁহার আদেশবাহী অনুচর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, সেই মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষের চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই শত বিভীষিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি আপনাকে সেই অনন্তস্বরূপের অনুচর বলিয়া এবং তাঁহাকে তোমার সখা বলিয়া উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি আপনাকেও মৃত্যুর অতীত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং তুমি দেখিবে যে, এই বিশ্ব-জগত সমস্তই, তোমার যিনি পিতামাতা, একমাত্র তাঁহারই রাজ্য; সুতরাং তুমি এই পৃথিবীতেই থাক বা অন্য যে কোন স্থানেই থাক, তুমি তাঁহারই রাজ্যে বাস করিবে, মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ভগবান যে প্রেমময়, স্নেহময়, তিনি যে আমাদিগকে

প্রীতি করেন ও ভালবাসেন, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। আমরা প্রতি পদেই দেখি যে, এখানে আমরা যতই কেন স্নেহ প্রেম লাভ করি না, তাহা কিছুতেই চরম তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—কোথায় যেন বেশ একটু অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই অতৃপ্তির আঘাত পাইলেই আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত দৃষ্টি পরম পরিতৃপ্তি লাভের আশায় উর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রীতির একবিন্দু লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আমরা প্রকৃতিতে এই সত্য নিহিত দেখি যে, প্রীতি একক থাকিতে পারে না—প্রীতির পাত্র পরস্পরের আদানপ্রদানসাপেক্ষ; তুমি আমাকে যদি প্রাণ দিয়া প্রীতি কর, তবে আমিও তোমাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিব না। এই ভাবটা তুমি আমি প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিই নাই। সুতরাং আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে ভগবানই ইহা প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিহিত এই নিয়মের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য—সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন না। শতসহস্র মুনিঋষি, সাধু এবং পাপদগ্ধ অসাধুও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দিতেছেন। সেই ভগবান স্বীয় প্রেম-মূর্ত্তিতে এই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই সত্যধর্ম্ম এই সত্য ঘোষণা করিবার অধিকারী যে, ভগবানের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই, এবং থাকিতে পারেও না। তাঁহার সূর্য্য তাঁহার চন্দ্র যেমন সকল গৃহে সকল ক্ষেত্রে সমভাবে কিরণ বিকীর্ণ করে—ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা প্রদান না করিলে কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ সেই পিতামাতায় স্নেহপ্রেম হইতে পাপীতাপী সাধু অসাধু কেহই বঞ্চিত হয় না—সকলেরই উপর তাহা সমভাবে শতধারে বর্ষিত হয়। পাপাত্মারা পাপচিন্তা ও পাপাচরণের অন্ধকার আবরণে আপনাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়াই তাহারা সেই স্নেহপ্রেম সকল সময়ে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না।

হৃদয় হইতে সকল সংশয় বিদূরিত করিয়া ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা বলিয়া জান; তাঁহাকেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া জান। তিনিই একমাত্র অকূলের কূল, দুর্ব্বলের বল এবং অনাথের নাথ। সমস্ত হৃদয় দিয়া, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক; ছোটবড় তোমার যে কোন অভাব, যে কোন আশা ভরসা, সকলই তাঁহাকে জানাও—তিনি যাহা মঙ্গল বুঝিবেন, তাহাই পূর্ণ করিবেন। তাঁহাকেই অন্তরতম সখা বলিয়া জানিও। হৃদয়ের আসন অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া পবিত্র কর—তিনি তাহাতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্যাকুল অন্তরে ডাকিবার মত তাঁহাকে ডাক, তিনি আপনাকে দিয়াও তোমাকে কৃতার্থ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ।

(শ্রীশুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

[আমরা এই প্রবন্ধটী সাদরে পত্রস্থ করিলাম। লেখক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী এক তরুণ যুবক। প্রবন্ধোক্ত বিষয়টী আজকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তির অন্তর আলোড়িত করিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। জানিলেও বলের সহিত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের অন্তরে যে কি রোগ প্রসারিত হইয়া উহাকে ক্ষয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবন্ধের সকল মতামতের সহিত সকলে একমত না হইলেও সেগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষীর ধীরভাবে আলোচনার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে গেলে অবিলম্বে আমাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তং সং]

ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বের উন্নতির পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে কেন? কারণগুলি জোরে ও স্পষ্টভাবে ধরা উচিত—কোনটী লুকাইয়া রাখিয়া বা কোনটীর বল কমাইয়া বলা উচিত নহে। চিকিৎসকের নিকট অতি ভীষণ ক্ষতও খুলিয়া দেখাইতে হয়, নতুবা আরোগ্য-লাভের আশা কম। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও পতনের কারণগুলি খুলিয়া দেখাইলে সুচিকিৎসা সম্ভব হইবে এবং আরোগ্যলাভ হইলে ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় উন্নতির পথে চলা সম্ভবপর হইবে নিঃসন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই দায়ী। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বর্ত্তমান মলিন অবস্থারও কারণ বুঝিতে পারিব। মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, তখন দেশের চতুর্দ্দিকে দুর্নীতি, উপধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি রাজত্ব করিতে-ছিল। তখন দেশের যাবতীয় মঙ্গলকার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিল। তখন অন্যায় অবিচার দেখিলেই ব্রাহ্ম-সমাজই মাথা তুলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইত; যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিত, ব্রাহ্মসমাজ তখনই তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিত। তখন ব্রাহ্ম-সমাজ লোকের মুখ চাহিয়া কাজ করিত না, ভগবানের আদেশ বলিয়া যাহা বুঝিত, তদনুসারেই কার্য্য করিত; তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রাণপণে যথার্থ ভগবৎপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিত; যেখানে কোন অন্যায়

দুর্নীতি ও কুপ্রথা দেখিত, ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বঙ্গদেশে উমেশচন্দ্র নামক এক যুবক যখন পাদরিদের প্রলোভনে পড়িয়া সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং তাহার স্ত্রীকে অন্যায়পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে চেষ্টা করে, তখন রাজরোষকে উপেক্ষা করিয়াও ব্রাহ্মসমাজই তাহার প্রতিবাদ করে এবং উমেশচন্দ্রকে পুনরায় হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিয়া শুদ্ধির পথ সর্ব্বপ্রথম খুলিয়া দেয়। ইহারই ফলে ভদ্র হিন্দুসমাজে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রখরবেগে অগ্রসর হওয়া রুদ্ধ হইল। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই বহুবিবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, মদ্যপানের প্রসার কমিয়া যায় এবং বাংলাদেশ শিক্ষাদীক্ষায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উন্নতির পথে খরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু এখন?—এখন ব্রাহ্মসমাজ লোকের মুখ চাহিয়াই কার্য্য করিতে ভালবাসে; অন্যায় বুঝিলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না—ভয়, পাছে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে মন্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না—লক্ষ্য দেখা যায় শুধু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে এবং অর্থসংগ্রহের দিকে।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে সাধনার বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মের গৃহে নিত্য উপাসনার কোনই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই উপাসনার উপকারিতায় সন্দিহান। ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই আজকাল আপনাদিগকে মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহারে মনে হয় যে, তাঁহারা অন্তরে নাস্তিকতাই পোষণ করেন। অনেকে আবার প্রকাশ্যেও নাস্তিকতার প্রচারে ইতস্তত করেন না।

এই সকল ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, নাস্তিকতার কোন ভিত্তি নাই, তখন তাঁহারা তর্ক করিতে বসেন যে তাহা মোটেই ভুল নহে এবং নিজেদের স্বপক্ষে নানা ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনেও ত্রুটী করেন না। তাঁহাদিগকে যদি বলা যায় যে, অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা সময়াভাবের অছিলায় তাহা করিতে অস্বীকার করেন এবং ঢাক পিটাইয়া লোকসকলকে বুঝাইতে চান যে তাঁহারাই তর্কে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যে সকল অসংখ্য গ্রন্থে প্রমাণসহযোগে নাস্তিকতাকে উচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থোক্ত প্রমাণরাশি তাঁহাদিগকে এক নিশ্বাসে, এক ঘণ্টায় বুঝাইতে হইবে; তাহা না পারিলেই নাস্তিকতার জয়জয়কার ধরিতে হইবে।

আসল কথা এই যে, তাঁহারা নিজের চেষ্টায় ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে প্রস্তুত নন, ধর্ম্মার্জ্জনে সচেষ্ট নন। বিনা চেষ্টাতে তাঁহাদের বুদ্ধির এক পা ফেলিতে না ফেলিতেই তাঁহারা সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে চান, ধর্ম্মার্জ্জনের সকল সুখ মুহূর্ত্তে উপভোগ করিতে চান। বিনা অভ্যাসে যখন কোনও বিদ্যাই আয়ত্ত হয় না, বিদ্যার্জ্জনের সুখও বিনা অভ্যাসে উপভোগ করা যায় না, তখন সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই কি বিনা অভ্যাসে লাভ করা যায় বা ধর্ম্মার্জ্জনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দই কি বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায়? তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না যে, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অপরা যে কোন বিদ্যাই হোক, তাহা বিনা যত্নে বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায় না, তজ্জনিত সুখও বিনা আয়াসে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহাদের যত ওজর আপত্তি পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ এবং ধর্ম্মসাধনজনিত সুখলাভের বেলায়। এই শেষোক্ত দুইটীর বেলায় তাঁহাদের নিকট সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া আবশ্যক—বিনা আয়াসে প্রয়াসে তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাও লাভ করিতে চান, ধর্ম্মসাধনের আনন্দও পাইতে চান। তাহা না পাইলেই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি আস্তিকের সমস্ত কথাই মিথ্যা! ধৈর্য্য ও ইচ্ছার অভাবে তাঁহারা মিষ্টদ্রব্যের আস্বাদ না লইয়াই বলিতে চান যে জগতে মিষ্ট বলিয়া কোন কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দোষ সাধনার অভাব। এই সাধনার অভাব আসে কেন? "জাত-ব্রাহ্মে"র সৃষ্টিই ইহার মূল কারণ বলিয়া অনুমান হয়। 'সাধনা থাক বা নাই থাক, ব্রাহ্মের সন্তান হইলেই ব্রাহ্ম হইবে' এই ভাবটাই ব্রাহ্মসমাজের পতনের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। বলিতে কি, বর্ত্তমানে "ব্রাহ্ম" নামক এক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করাই যেন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যদি জাতিভেদই স্বীকার করিতে হয়, তবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের জাতিভেদ কি অপরাধ করিল? সেই হিন্দুসমাজেও তো ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ গণ্য হয়। আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সমুদয় প্রথা সুসংস্কৃত করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়া এবং আদিসমাজ জাতিভেদ প্রথা উঠাইতে চাহেন না মূলত এই অপবাদ দিয়াই না একদল ব্রাহ্ম আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন শাখা স্থাপন করিলেন? প্রকৃতই, জন্মগত জাতিভেদের অনেক দোষ আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র সাধনাবিহীন হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বজনপূজ্য হইবে, এবং চণ্ডাল অতি শুদ্ধ ও পবিত্র হইলেও সর্ব্বজনহেয় হইবে, এই বিধান কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখা মুখে জাতিভেদবিরোধী হইলেও কার্য্যত কি তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন

করিতেছেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মদিগের অনেকেই মুখে না হইলেও কার্য্যত হিন্দুসমাজপ্রচলিত জাতিভেদের পক্ষপাতী। তদ্ব্যতীত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ আদিসমাজের উপর সত্য হৌক বা মিথ্যা হৌক যে দোষ আরোপ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, এখন ব্রাহ্ম নামক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে সেই জাতিভেদরক্ষার দোষে কি নিজেরাই দোষী হইতেছেন না?

প্রকৃত ব্রাহ্ম কে? সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম কি বিষয়কর্ম্ম করেন না? ব্রাহ্ম কি আমোদপ্রমোদ করেন না? প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি সবই করেন; কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মই ব্রহ্মকেন্দ্রক। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া তিনি কিছুই করেন না। এমন কথা নহে যে, ব্রাহ্মমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না বা তাঁহাকে কোন প্রকার পাপতাপ স্পর্শ করিবে না। পাপ বা ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও ব্রাহ্ম বলা চলে, যদি দেখা যায় যে, তিনি সেই ভ্রমপ্রমাদ বা পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যিনি বুক ফুলাইয়া বলেন, "বেশ করিয়াছি, এই পাপ আমি করিয়াছি এবং আরও করিব", যিনি প্রকাশ্যে পাপাচরণ করিতেছেন, অথচ তাহা ত্যাগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাকে কিছুতেই ব্রাহ্ম বলা চলে না।

বর্ত্তমানে কি দাঁড়াইয়াছে? অন্যান্য শাখাসমাজে দেখা যায়, ব্রাহ্ম হইবার তিনটী উপায়—১) খাতায় নাম লিখানো, (২) কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান এবং (৩) ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী বিবাহ। যে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্ম নামক জন্মগত পঞ্চম জাতি সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত! হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিবার কারণে ব্যথা অনুভব করায় যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই ব্রাহ্মসমাজ আজ ধর্ম্মসাধনা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও আড়ম্বরকেই উচ্চ আসন প্রদান করিতেছে! সেই পাপেই আজ ব্রাহ্মসমাজ পতনোন্মুখী! ইহা অনেকেই জানেন যে, কোন এক শাখাসমাজের অন্তর্ভুক্ত, ধর্ম্মসাধনাহীন কিন্তু ধনে মানে অগ্রগণ্য কোন এক ব্রাহ্মকে যখন বলা গেল যে, তিনি অমুক অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা তাঁহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; তখন তিনি প্রকাশ্যেই বলিয়াছিলেন—'অমুক পাপ আমি করি? বেশ করিয়াছি, আরও করিব; ইচ্ছা হয়, তোমরা সভ্যশ্রেণী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিও।' কিন্তু তাঁহার নাম তুলিয়া দিতে কি কেহ সাহস করিলেন? না—করিলেন না, কারণ তিনি একজন নামজাদা ব্রাহ্ম এবং নামজাদা ব্রাহ্মের পুত্র; সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি সাধনাবিহীন ও অনাচারী হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম!

বর্ত্তমানে তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজে এবং শিক্ষিত হিন্দুসমাজে মাদকসেবন ব্যভিচার প্রভৃতি পাপসকল যে খরধারে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সংবাদ রাখেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাহারা ঐ সকল পাপে ডুবিয়া আছেন; কিন্তু কাহার এত বড় সাহস আছে যে, সেই সকল অনাচারী ব্যক্তির নাম ব্রাহ্মসমাজের তালিকা হইতে কাটিয়া দেন? এই যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে নবাগত পাপ মহিলানৃত্য—একমাত্র আদিসমাজ ব্যতীত আর কোন্ ব্রাহ্মসমাজ উহার বিরুদ্ধে সবলে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণই তো এইখানে। সাধনা নাই; এবং সাধনার অভাবেই সাধনাবিহীন ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যে অব্রাহ্ম বলিবার ক্ষমতাও নাই। এমন কি, অন্যায় আচরণ, পাপাচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কার্য্যত কোন প্রকার প্রতিবাদ করিবারও ক্ষমতা নাই! তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, অন্যায় বা পাপাচরণ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিলে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। তবেই কি প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে না যে, অন্যায় বা পাপকারীগণকে ধরিয়া রাখিয়াই আমরা একটি ধর্ম্মসমাজ গঠনে প্রয়াসী? সে আশা বৃথা!

পাপ কখনই ধর্ম্মসমাজের উন্নতির কারণ বা সহায় হইতে পারে না। পাপাচারীদিগকে অন্তরঙ্গরূপে লইয়া যে সমাজ, তাহা ধর্ম্মসমাজরূপে কখনই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। পাপগর্বীদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বরং বিপরীতে আমরা দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজে পাপগর্বীদিগের আধিপত্য থাকাতেই তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে না —ব্রাহ্মসমাজ পতনের অভিমুখেই চলিয়াছে। পাপগর্বীগণ বিনা যদি ব্রাহ্মসমাজ না চলে, তবে সেরূপ ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যাক। তাহাও শতবার প্রার্থনীয়, কিন্তু ধর্ম্মসমাজের আবরণে, ধর্ম্মের ছদ্মবেশে পাপের প্রশ্রয়দান ও ভণ্ডামি নিতান্তই অসহ্য। পাপগর্বীদিগকে পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে যদি একটী লোকও না থাকে তাহাও বরং লক্ষবার প্রার্থনীয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে একটীও অননুতপ্ত পাপগর্বী থাকে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ঈপ্সিত নহে। আদর্শ ঠিক থাকিলে মানুষ পাওয়া কঠিন হয় না; কিন্তু আদর্শ নষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হয়।

প্রত্যেক ধর্ম্মই আরম্ভে এক-একজন মহাত্মা প্রতি-

ষ্ঠিত করেন ; পরে তাঁহার ও তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদিগের আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই অন্যান্য লোকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজের কথাই ধরা যাক। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার কয়জন শিষ্য ছিলেন ? যে কয়জন ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত সাধনা ছিল। তাহারই ফলে, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশের যতটা উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন, আজ লক্ষ বক্তৃতাতেও তাহার শতাংশের একাংশ কাজ হইতেছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ফলেই তৎকালীন বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, ইহা যেমন অবিসম্বাদিত সত্য ; সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ আজ পতনের অভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য। সেকালে ব্রাহ্ম বলিলে আদর্শচরিত্র ব্যক্তিকেই বুঝাইত—ব্রাহ্মকে আদালতে শপথ করিতে হইত না, তাহার ব্রাহ্মত্বই সত্যসাধনের প্রমাণরূপে গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজ, কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন—উহার অনুসরণে শিক্ষিতসমাজ ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন অনেকটা একার্থবাচক হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মচর্য্যের ও উপাসনার অভাব, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি একাধিপত্য স্থাপনে বড়ই অগ্রসর দেখা যায়।

ইহার প্রতীকার কি ? ইহার প্রতীকার ব্রাহ্মসমাজের নিজের হাতে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মদিগকে শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করা। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রতীকার-ব্যবস্থা প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তার হাতে। তাঁহার কর্ত্তব্য—পরিবারে পারিবারিক উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মসাধনে দৃষ্টি রাখা। গৃহে ধর্ম্মসাধনার ব্যবস্থা না করিলে গণ্ডা গণ্ডা রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ফল হইবে না, শত ব্রহ্মবিদ্যালয়েও কিছু হইবে না এবং লক্ষ উপদেশেও কিছু হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রতি পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য—সেই পরিবারস্থ প্রত্যেক শিশুকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য প্রত্যেক পরিবারে যাহাতে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ধর্ম্মসাধনা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা। সময়ের অভাব প্রভৃতি আপত্তিতে যেন উপাসনা বন্ধ না হয়। তাস-পাশার আড্ডায়, বা চা-পার্টি প্রভৃতিতে যাইবার সময় হইতে পারে, আর উপাসনারই সময় পাওয়া যায় না, ইহা অবিশ্বাস্য—ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত কারণ।

কেবল পারিবারিক উপাসনা করিলেও চলিবে না। পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যেককে নিজ জীবনে ধর্ম্মসাধন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা বালকবালিকাকে ধর্ম্মপথে চলিবার উৎসাহ দান করিতে হইবে। পরিবারের কর্ত্তা উপদেশ দিলেন—মদ্যপান করিও না, ব্যভিচার করিও না, অথচ নিজে সেই সকল পাপে লিপ্ত রহিলেন, বলা বাহুল্য, সেরূপ উপদেশ বা উপাসনা হইতে কোনও ফল আশা করা যায় না। যিনি প্রকাশ্যে পাপ আচরণ করেন এবং সগর্ব্বে বলেন যে "যেহেতু সমাজ বিধান করিতেছে যে, অমুক পাপ করিবে না, অতএব আমি ঐ পাপ করিয়া আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (??) মর্য্যাদা রক্ষা করিব" (!!), অর্থাৎ যিনি স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতার নামে প্রশ্রয় দিয়া সমাজের সর্ব্বনাশসাধনে সমুদ্যত হন, সমাজের উচিত—সাহসের সহিত সমাজের সভ্য-তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া ; অর্থাৎ সমাজ যাহাতে পাপীসংঘে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

এইরূপে সমাজ হইতে পাপ দূর করিতে হইলে ঠগ বাছিতে যদি গাঁ উজাড় হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি ঠগ বাছিবার কার্য্যে নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশধারী ঠগদিগকে চালাইবার চেষ্টা প্রকৃত ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অনুচিত ও অধর্ম্ম। আর ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে কি না, সে ভাবনা তোমার আমার নহে। আমাদের অন্তরে ভগবান যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, তদনুসারে আমরা কার্য্য করিবারই অধিকার পাইয়াছি। আমাদের কাজ—ভগবানের স্বহস্তে প্রজ্জ্বলিত শুভবুদ্ধির প্রদীপের সাহায্যে যেখানে যাহা কিছু আবর্জ্জনা দেখিব, তাহা দূর করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র ভাবের সুগন্ধে পূর্ণ রাখা। এবিষয়ে ইতস্তত করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, আমরা মুখে ভগবানকে যতই স্বীকার করি না কেন, কাজে তাঁহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি—ভগবান অপেক্ষা সংসারসুখই আমাদের নিকটে বেশী প্রিয়। আর, ইহাই বা মনে করিব কেন যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাপকে নিষ্কাশিত করিতে গেলেই ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হইবে ? ব্রাহ্মসমাজের যদি সেই দশাই আসিয়া থাকে, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তেমন ব্রাহ্মসমাজ বিস্মৃতিসাগরে নিলীন হইয়া যাক এবং তাহার স্থলে নির্ম্মল বিশুদ্ধ নবতর ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করুক ; পূর্ব্বের মত দেশকে এবং সমগ্র জগতকে পুণ্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে, উন্নতির পথে ও স্বাধীনতার পথে সবল ধাক্কা দিয়া অগ্রসর করিয়া দিক। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মধনে এখনও তত দরিদ্র হয় নাই।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

(চতুর্থে ব্রহ্মণ এবাক্ষিগতত্বাধিকরণে সূত্রাণি—)

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥১৬॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১৭॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—
ছায়াজীবৌ দেবতেশৌ বাঽসৌ যোঽক্ষণি দৃশ্যতে ॥
আধারদৃশ্যতোক্তেশাদন্যেষু ত্রিষু কশ্চন ॥ ৭ ॥
কং খং ব্রহ্ম যদুক্তং প্রাক্ তদেবাক্ষণ্যুপাস্যতে ॥
বামনীত্বাদিনাঽন্যেষু নামৃতত্বাদিসম্ভবঃ ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যস্য চতুর্থাধ্যায়ে—উপকোসলবিদ্যায়ামুপকোসলং শিষ্যং প্রতি সত্যকামো গুরুরাহ। তত্রত্যং বাক্যমেতৎ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতং এতদ্ব্রহ্ম" ইতি। তত্র চতুর্ধা সংশয়ে সতি—'অক্ষণি সর্বৈর্দৃশ্যমানা ছায়া' ইতি তাবৎ প্রাপ্তং, অক্ষ্যাধারত্বদৃশ্যত্বয়োস্তস্যামপি স্পষ্টত্বাৎ। যদ্বা—জীবোঽয়ং ভবিতুমর্হতি, রূপদর্শনবেলায়াং তস্য চক্ষুষ্যবস্থিতত্বেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃশ্যমানত্বাৎ। অথবা —দেবতা স্যাৎ, "আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইতি দর্শনাৎ। সর্ব্বথা ন পরমাত্মা তস্যাঽধারত্বদৃশ্যত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ—ছায়াজীবদেবেষু যঃ কোঽপ্যস্ত।

ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" ইতি সুখরূপং, আকাশবৎ পরিপূর্ণং যদ্ব্রহ্ম পূর্ব্ববাক্যেনোক্তং, তদেব "য এষোঽক্ষিণি"—ইতি প্রকৃতবাচকেনৈতচ্ছব্দেন পরামৃশ্যাক্ষণ্যুপাস্যত্বেনোপদিশ্য বামনীত্বভামনীত্বসংযদ্বামত্বাদিগুণানুপাসনায়োপদিশতি। বামনীত্বং কামপ্রাপকত্বং। ভামনীত্বং জগদ্ভাসকত্বং। সংযদ্বামত্বং প্রাপ্তকামত্বং। এতৈর্গুণৈরুপাস্য ব্রহ্মণঃ সোপাধিকত্বাদক্ষ্যাধারত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃশ্যমানত্বং চ ন বিরুধ্যতে। ছায়াজীবদৈবতেষু অমৃতত্বাভয়ত্বাদীনি ন সম্ভবন্তি। তস্মাৎ ঈশ্বরোঽত্রোপাস্যঃ ॥

(চতুর্থে ব্রহ্মের অক্ষিগতত্ব অধিকরণে সূত্রগুলি—)

সূত্রের অনুবাদ। অন্তরে উপপত্তি হেতু ॥ ১৩ ॥ স্থানাদির কথনপ্রযুক্ত ॥১৪॥ এবং সুখবিশিষ্ট অভিহিত হওয়া প্রযুক্ত ॥১৫॥ উপনিষৎ যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার গতি অভিহিত হওয়া হেতু ॥১৬ ॥ অনবস্থিতি হেতু এবং অসম্ভব হওয়ায় অন্য নহে ॥১৭॥

চতুর্থ অধিকরণ রচনা করিতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ।—চক্ষে যিনি দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি ছায়া বা জীব বা দেবতা বা ঈশ্বর? আধার এবং দৃষ্টির বিষয় বলিয়া উল্লিখিত থাকা হেতু ঈশ্বর ভিন্ন অপর তিনটীর মধ্যে কোনটী (হউক) ॥৭॥

পূর্ব্বে "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" যাহা উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই চক্ষে উপাসনা করা হয়। "বামনীত্ব" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অপরগুলিতে "অমৃতত্ব" প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

টীকার অনুবাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে—উপকোসল বিদ্যাপ্রকরণে শিষ্য উপকোসলের প্রতি গুরু সত্যকাম বলিয়াছেন। সে স্থলে এই বাক্য (আছে)—"যে এই পুরুষ চক্ষে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি আত্মা, এই কথা বলিলেন। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম" ইতি। সেই বাক্য বিষয়ে চারি প্রকার সংশয় হইলে—'চক্ষে সকলের দৃশ্যমান ছায়া' ইহাই প্রাপ্ত হয়; কারণ সেই ছায়াতে চক্ষুর আধারত্ব দৃষ্টিবিষয়ত্ব স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অথবা—ইনি জীব হইতে পারেন, কারণ রূপদর্শনের সময়ে তাহা চক্ষুতে অবস্থিতি হেতু অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান হয়। অথবা দেবতা হউক —কারণ (শ্রুতিতে) দৃষ্ট হয় যে, "আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।" পরমাত্মা কোনপ্রকারেই নহেন, কারণ তাঁহার আধার থাকা এবং দৃষ্টিবিষয় হওয়া অসম্ভব। অতএব, ছায়া জীব এবং দেবতা, ইহাদের মধ্যে যে কেহ হউক।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" এই পূর্ব্ববাক্যে সুখরূপ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই "যে ইনি চক্ষে"—এই প্রকৃতবাচক "ইনি" শব্দের দ্বারা স্থির করিয়া চক্ষে উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়া বামনীত্ব (শুভদাতৃত্ব) ভামনীত্ব (প্রকাশরূপত্ব) সংযদ্বামত্ব (আপ্তকামত্ব) ইত্যাদি গুণসমূহকে উপাসনার জন্য উপদেশ করিতেছেন। বামনীত্ব অর্থে কামপ্রাপকত্ব। ভামনীত্ব অর্থে জগদ্ভাসকত্ব। সংযদ্বামত্ব অর্থে প্রাপ্তকামত্ব। এই সকল গুণের দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব হেতু চক্ষুর আধারত্ব এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিষয়ত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। ছায়া জীব ও দেবতাতে অমৃতত্ব অভয়ত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর নহে। অতএব এস্থলে ঈশ্বর উপাস্য ॥

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে উপকোসল-সত্যকামসংবাদ নামক একটী উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানে উপকোসল নামক এক শিষ্যের প্রতি তাঁহার গুরু সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার নাম 'উপকোসলবিদ্যা'। উক্ত উপদেশে এই একটী বাক্য আছে—"যে এই পুরুষ চক্ষে দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা, ইহা সত্যকাম বলিয়াছিলেন।

ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম।" এস্থলে চারিটী সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। প্রথম সন্দেহ হইল, নয়নতারার মধ্যে সকলের নিকট যে প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে সম্ভবত উক্ত প্রতিবিম্বই উপলক্ষিত হইতেছে? কারণ, শ্রুতিবাক্যে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত "প্রতিবিম্বের" খুবই মিল দেখা যায়। চক্ষুতে দৃশ্যমান পুরুষের উল্লেখে দুইটী বিষয় স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—উক্ত পুরুষের আধার চক্ষু এবং উহার দৃষ্টিগোচরতা; প্রতিবিম্বেরও আধার চক্ষু এবং প্রতিবিম্বও সকলের দৃষ্টিগোচর।

দ্বিতীয় সংশয় "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে "জীব" হইতে পারে? কারণ, কোন কিছু রূপ দেখিতে গেলেই চক্ষুর ভিতর দিয়াই জীবের সেই রূপকে দেখিতে হয়—চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান হইলে চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করে (ইহাকেই "অন্বয়" বলা যায়) এবং ঐ প্রকারে চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান না হইলে চক্ষু দর্শন করিবার শক্তি লাভ করে না (ইহাকেই "ব্যতিরেক" বলা যায়)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন কিছু দেখিবার কালে জীব চক্ষুকে আশ্রয় করে এবং অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেকের শাস্ত্রীয় লক্ষণ হইতেছে "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা" এবং "তদসত্ত্বে তদসত্তা" অর্থাৎ একটীর অস্তিত্বে অপরটীর অস্তিত্ব এবং একটীর অভাবে অপরটীর অভাব। দৃষ্টান্ত যথা—ধূমের অস্তিত্বে বহ্নির অস্তিত্ব (অন্বয়) এবং বহ্নির অভাবে ধূমের অভাব (ব্যতিরেক)। সেইরূপ, জীবের চক্ষুতে অবস্থিতিতেই রূপ দৃষ্টিবিষয় হয় এবং চক্ষুতে অনবস্থিত হইলেই রূপ দৃষ্টির অবিষয় হয়। এই প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা জীব চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয়। অতএব "চক্ষুতে দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "জীব"ই উপলক্ষিত, ইহা পূর্ব্বপক্ষ সংশয় করিতেছে।

তৃতীয় সংশয়—"চক্ষুতে অবস্থিত দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "দেবতা"ও হইতে পারে? শ্রুতিতে আছে—"আদিত্য চক্ষু হইয়া (জীবমাত্রের) অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।" এখানে শ্রুতিবাক্য অনুসারে চক্ষুকেই আদিত্য-দেবতার আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শঙ্করভাষ্যে একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—"রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ এই আদিত্য এই চক্ষে রশ্মি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য দেবতা রশ্মি বা তেজের দ্বারা চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তেজ দৃশ্যমান অর্থাৎ সকলেরই দৃষ্টিগোচর বিষয়; সুতরাং আদিত্যও চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলেও দৃশ্যমান বা দৃষ্টিবিষয় হইলেন। কাজেই পূর্ব্বপক্ষের মতে—"চক্ষুতে অবস্থিত এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" ইহার অর্থে আদিত্যরূপ দেবতা হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বপক্ষ স্থির করিলেন যে, ঐ পুরুষ অর্থে পরমাত্মা হইতে পারে না, কারণ পরমাত্মা সকলের আধার; অতএব তাঁহার কোন আধার সম্ভব নহে, এবং তিনি যখন স্বয়ং সর্ব্বদ্রষ্টারূপে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি দৃষ্টিবিষয় হইতে পারেন না, কারণ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃষ্টিগোচরতা উভয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মী।

উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের উপরোক্ত তিনটী সংশয় সঙ্গত নহে। যে শ্রুতির ভিত্তিতে এই বিচার চলিতেছে, ইহার পূর্ব্বে "কং ব্রহ্ম" ও "খং ব্রহ্ম" এই দুইটী শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। "কং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম সুখস্বরূপ এবং "খং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ। বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে "অক্ষিতে অবস্থিত যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" বলিয়া যে পুরুষ উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে সুখস্বরূপ ও আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, উভয়ের দ্বারা একই ঈশ্বর উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে "এই" যে শব্দ আছে, তাহা দ্বারা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "চক্ষুতে দৃশ্যমান" বলায় বুঝা যাইতেছে যে, সেই ব্রহ্মকে অক্ষিস্থরূপে বা চক্ষুর চক্ষুরূপে উপলব্ধি করিয়া উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তাঁহাকে কি প্রণালীতে উপাসনা করা যাইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, তাঁহার "বামনীত্ব" "ভামনীত্ব" "সংযদ্বামত্ব" প্রভৃতি গুণসকল অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবে। "বামনীত্ব" অর্থে "কামপ্রাপকত্ব" অর্থাৎ জীবের কামনাসকল পূর্ণ করিবার শক্তি। "ভামনীত্ব" অর্থে "জগদ্ভাসকত্ব" অর্থাৎ জগত প্রকাশ করিবার শক্তি। "সংযদ্বামত্ব" অর্থে "প্রাপ্তকামত্ব" অর্থাৎ "পূর্ণকামত্ব"; ব্রহ্মের কামনার অবসরই নাই, কারণ তাঁহার সকল ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল গুণ অবলম্বনে উপাস্য ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে গুণরূপ উপাধি আরোপিত হইল। এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্তত "ভামনীত্ব" বা জগৎপ্রকাশকত্ব গুণ স্বীকার করিবার কারণে ব্রহ্মকে জগতের মধ্যে সহজেই অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে, অর্থাৎ তিনি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াই ইহাকে প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং জগৎরূপ আধারে তিনি অবস্থিত বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চক্ষু যখন সমগ্র জগতেরই এক অংশ, তখন তাঁহাকে চক্ষুরূপ আধারেও অবস্থিত সহজেই বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা না গেলেও তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে অর্থাৎ শাস্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান বা উপলব্ধির বিষয়। পূর্ব্বপক্ষ যে

বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আধার থাকা এবং দৃষ্টিবিষয় হওয়া অসম্ভব, সিদ্ধান্তপক্ষ তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তাঁহার যুক্তি অবলম্বনে ঐ উক্তির সঙ্গে চক্ষুকে ঈশ্বরের আধার-রূপে গ্রহণ এবং ঈশ্বর দৃশ্যমান, এই উক্তির কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আর, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে, ছায়া, জীব ও দেবতাতে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি থাকা সম্ভব নহে—শ্রুতিবাক্য অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরেই ঐ সকল গুণ আছে। অতএব, বিচার্য্য শ্রুতিতে ঈশ্বর উপাস্য, ইহাই সিদ্ধান্ত।

(পঞ্চমে পরমেশ্বরস্যৈবান্তর্যামিতাধিকরণে সূত্রাণি—)

সূত্র—

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥১৯॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

ব্যাখ্যাশ্লোক—

প্রধানং জীব ঈশো বা কোঽন্তর্যামী জগৎপ্রতি।
কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাৎ জীবো বা কর্ম্মণো মুখাৎ ॥৯॥
জীবৈকত্বামৃতত্বাদেরন্তর্য্যামী পরেশ্বরঃ।
দ্রষ্টৃত্বাদের্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ ॥১০॥

বৃহদারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকং প্রত্যাহ—"যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তত্র—পৃথিব্যাদিজগৎপ্রতি হ্যন্তর্য্যামী শ্রূয়তে, তস্মিন্ ত্রেধা সংশয়ে সতি "প্রধানং" ইতি প্রাপ্তম্। তস্য সকলজগদুপাদানত্বেন স্বকার্য্যং প্রতি নিয়ামকত্বসম্ভবাৎ। অথবা—জীবোঽন্তর্য্যামী। স হি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্মানুষ্ঠিতবান্। তচ্চ কর্ম্ম স্বফলদানায় ফলভোগসাধনং জগদুৎপাদয়তি। অতঃ কর্ম্মদ্বারা জগদুৎপাদকত্বাজ্জীবোঽন্তর্যামী ॥

ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"এষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যন্তর্যামিণো জীবতাদাত্ম্যমমৃতত্বং চ শ্রূয়তে। তথা—পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিষু সর্ব্ববস্তুষন্তর্যামিত্বোপদেশেন সর্ব্বব্যাপিত্বং প্রতীয়তে। তেভ্যো হেতুভ্যোঽন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ। ন চ প্রধানস্যান্তর্যামিত্বং সম্ভবতি, "অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদ্যবগমাদচেতনস্য প্রধানস্য তদসম্ভবাৎ। নাপি জীবোঽন্তর্যামী, "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি জীবস্য নিয়ম্যত্বশ্রবণাৎ। তস্মাৎ—অন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ ॥

(পঞ্চম অধিকরণে পরমেশ্বরে অন্তর্যামিত্ব বিষয়ক সূত্রসকল—)

সূত্রের অনুবাদ—

অন্তর্যামী (ব্রহ্ম) অধিদৈবাদি শব্দে; তাঁহার ধর্ম্ম উল্লিখিত হওয়ায় ॥১৮॥ স্মার্ত্ত বা সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত "প্রধান" নহে; তাহার ধর্ম্ম অনুক্ত থাকা হেতু ॥১৯॥ শরীর বা শরীরস্থ জীবও (নহে), উভয় (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন) শাখাতেই ইহাকে ভিন্নভাবে বলা হইয়াছে ॥২০॥

পঞ্চম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ—

জগতের অন্তর্যামী কে—প্রধান, জীব অথবা ঈশ্বর? কারণত্ব প্রযুক্ত প্রধান হউক, বা কর্ম্মের মুখ বা অনুষ্ঠাতা হওয়ায় জীব হোক ॥৯॥ জীবের সহিত একত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি হেতু অন্তর্যামী পরমেশ্বর। দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি হেতু প্রধান নহে; নিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত জীবও নহে। ১০

বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালককে বলিতেছেন—"যিনি পৃথিবীকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত"। সেই বাক্যে—পৃথিবী প্রভৃতি জগতের যিনি অন্তর্যামী শ্রুত হন, সে বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে "প্রধান" প্রাপ্ত হইতেছে। সকল জগতের উপাদানত্ব হেতু তাহার নিজ কার্য্যের নিয়ামক হওয়া প্রযুক্ত। অথবা জীব অন্তর্যামী—উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং সেই কর্ম্ম স্বীয় ফলদানের জন্য ফলভোগের সাধনস্বরূপ জগৎ উৎপাদন করে। অতএব কর্ম্মের দ্বারা জগতের উৎপাদকত্ব হেতু জীব অন্তর্যামী।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"ইনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত" এই বাক্যে অন্তর্যামীর জীবের সহিত তাদাত্ম্য এবং অমৃতত্ব শ্রুত হয়। সেইরূপ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকল বস্তুতে অন্তর্যামিত্বের উপদেশের দ্বারা সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতীত হয়। ঐ সকল কারণে অন্তর্যামী পরমেশ্বর। প্রধানের অন্তর্যামী হওয়া সম্ভব নহে, "অদৃষ্ট দ্রষ্টা অশ্রুত শ্রোতা" এই বাক্যে দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি জানা যাওয়ায় অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা অসম্ভব হওয়া প্রযুক্ত। জীবও অন্তর্যামী নহে—"যিনি আত্মাকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন" এই বাক্যে জীবের নিয়মিত হওয়া শ্রুত হয় বলিয়া। অতএব—অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

তাৎপর্য্য।—বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালকসংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের প্রতি উপদেশ দিতেছেন—"যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।" ঐ স্থলে দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য অনুরূপ আরও অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল উপদেশে দেবতা, লোকচরাচর, বেদ বা জ্ঞান, যজ্ঞ, ভূত বা প্রাণী এবং আত্মা এই সকলের অন্তরে অবস্থিত নিয়ামক কোন একজন অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী বলিয়া শ্রুত হন। এখন পৃথিব্যাদি জগতের অন্তর্যামী কে, এই বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম সংশয়

এই যে, এই অন্তর্যামী "প্রধান" কি না। স্মার্ত্ত অর্থে স্মৃত্যুক্ত। বেদকে স্মরণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র রচিত হয়, সে সকল শাস্ত্রই স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যও বেদ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত এবং স্মৃতি নামে উহার ব্যবহার পরম্পরাসিদ্ধ। যে বস্তু যাহার উপাদান কারণ, সে বস্তু স্বভাবতই তাহার অন্তর্যামী বা নিয়ামক হওয়া সম্ভব। সাংখ্যেই "প্রধান" বা সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। সেই কারণে এস্থলে "স্মার্ত্ত" শব্দের অর্থে "প্রধান" ধরা হইয়াছে। ইহা ধরিয়াই পূর্ব্বপক্ষ সংশয় উপস্থিত করিতেছেন যে, "প্রধান" যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন তাহারই জগতের অন্তর্যামী হওয়া সম্ভব। সিদ্ধান্তপক্ষ তদুত্তরে বলেন যে, প্রধানের অন্তর্য্যামিত্ব সম্ভব নহে। সাংখ্যে প্রধানকে অচেতন বলা হইয়াছে। দেখা শোনা প্রভৃতি চেতনের ধর্ম্ম। সুতরাং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি অচেতন প্রধানে অসম্ভব। কিন্তু শ্রুতি অন্তর্যামী বাক্যের শেষে অন্তর্যামীকে "অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা" বলিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে "যিনি পৃথিবীকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত" এই বাক্যের "অন্তর্যামী" শব্দে প্রধানকে ধরা হয় নাই।

তখন পূর্ব্বপক্ষ এই সন্দেহ উপস্থিত করিলেন যে, তবে চেতনধর্ম্মা জীবই অন্তর্যামী হউক। জীব চেতন; তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি চেতনের সকল ধর্ম্মই সংগত হইবে। অদৃষ্ট ও অশ্রুত এই দুইটী বিশেষণও জীব সম্বন্ধে বেশ সংগত হয়। আবার, জীবই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। কর্ম্মবাদীরা বলেন, কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে; কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে ফল দিবার জন্য ফলভোগের উপায়স্বরূপে জীব এই জগৎ উৎপাদন করিতেছে। অতএব কর্ম্মের ভিতর দিয়া জগতের উৎপাদক হওয়ায় জীব জগতকে নিয়মিত করিতেছে বলা যায়; সুতরাং জীবকে অন্তর্যামী বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, জীবকে অন্তর্যামী বা জগতের নিয়ামক বলা যায় না। কারণ, শ্রুতিতে এই অন্তর্যামী বাক্যের শেষে আছে—"যিনি আত্মাকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন"। এই বাক্যের "আত্মাকে" শব্দে যে জীব বুঝাইতেছে, তাহা বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালক সংবাদের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। এখন, জীবাত্মা যখন স্বয়ং নিয়মিত হইতেছে, তখন উহা নিয়ামক বা অন্তর্যামী হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, একমাত্র পরমেশ্বরই অন্তর্যামী শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৩)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৩ শকের বৈশাখে—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মোদ্ধৃত" পাই। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় প্রকাশিত। জ্যৈষ্ঠ—"শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য"।

১৭৭৪ শকের ফাল্গুন মাসে—"ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা—১১ মাঘ ১৭৭৪ শক—ব্রাহ্মসমাজের বয়ক্রম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল। অদ্য ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। ১৭৭৫ শক জ্যৈষ্ঠে—"বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন।" ১৭৭৫—ফাল্গুন—"শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত * * * পাঠ করিলেন।" "অদ্য (১৭৭৫—১১ই মাঘ) আমাদের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। ১৭৭৬—ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, "অদ্য (১৭৭৬—১১ মাঘ) পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

১৭৭৭—ফাল্গুন—"এই ব্রাহ্মসমাজ * * * ষড়বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে।"

১৭৭৮—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক * * * নির্ব্বাহ হয়" শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় * * পাঠ করিলেন—

"মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।"

১৭৭৯—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * * ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক * * * নির্ব্বাহ হয়।" "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর * * পাঠ করেন—অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

১৭৮০—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক * * নির্ব্বাহ হইয়াছে।" "শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করেন—অদ্য ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।"

১৭৮২—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক * * নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।"

ঐ সংখ্যায়—"ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত" প্রবন্ধে—"গত ২৪ পৌষ * * ব্রাহ্মদিগের যে বার্ষিক সভা হইয়াছিল তাহাতে সুধীবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।" * * "একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল * * এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হয়।"

রাজা রামমোহন রায় "এক উপাসনা সমাজ স্থাপন" করেন, সেই সমাজ আমাদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। "প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল।"

১৭৮৩—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক * * নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।"

১৭৮৪—ফাল্গুন—"অদ্য (১১ মাঘ) ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবস।"

১৭৮৫—মাঘ—"আগামী মাঘ মাসের একাদশ দিবসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ চতুস্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে।" এই মাঘ মাসে দেখি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহঃসম্পাদক।

১৭৮৬—পৌষ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত।

ফাল্গুন—"পঞ্চত্রিংশ—সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১১ মাঘ ১৭৮৬ শক"।

১৭৮৭—জ্যৈষ্ঠ—"রামমোহন রায়ের অনুগত শিষ্য" লেখেন—

"ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তিকাল ১৭৪১ শক হইতে" "এবং ১৭৫১ শকে * * উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।" "রামমোহন রায় এই কলিকাতাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করেন * * ১৭৫১ শকের ১১ মাঘে সংস্থাপন করেন।" "১৭৪১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আন্দোলন; ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা"।

১৭৮৭—আষাঢ়—"রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" লেখেন—

"রামমোহন রায় ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাতে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে অবতরণিকা নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—ইহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনা বিধানের প্রথম আভাসমাত্র অঙ্কুরিত হয়।" "১৭৫১ শকে রামমোহন রায়ের দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। একটী কলিকাতাতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।" * * "১১ মাঘে সাম্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত (ব্রহ্মসভার) দলপতিরা ধনদান দ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন"।

১৭৮৭—অগ্রহায়ণ—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—"যখন তিনি (রাজা রামমোহন ১৭৩৬ শকে * * এখানে (কলিকাতায়) আইলেন"। "রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার কতক দিন পূর্ব্বে * * খ্রীষ্টানদিগের উপাসনাগৃহে যাইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। * * একদিন সেই উপাসনাগৃহ হইতে আসিবার সময় * * কথায় কথায় বলিলেন—আমরা পরের সমাজে কেন যাই? * * তারি কিছুদিন পরে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। যখন প্রথম ইহা সংস্থাপিত হইল, তখন সেখানে কি হইত?" ইহার পরে উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৮৭ ফাল্গুন—"ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। এই উৎসবে মহর্ষিদেবের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আচার্য্যকার্য্য করিয়াছিলেন।

১৭৮৮—ফাল্গুন—"সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১৭৮৮ শক ১১ মাঘ।"

[মন্তব্য:—আমরা এবারে ১৭৭৩ শক হইতে ১৭৮৮ শক পর্য্যন্ত ষোল বৎসরের পত্রিকা হইতে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক প্রসঙ্গে উপযোগী যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মণবিদায় উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"এই জন্মদিবস কবে—১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে অথবা ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে?" "রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্যের" (৺শিবচন্দ্র দেবের) উক্তিতে আমরা পাইতেছি (১৭৮৭—আষাঢ়ের উদ্ধৃত অংশ দেখ) যে ১১ মাঘের উৎসবেই ব্রাহ্মণবিদায় হইত। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ১৭৫০ শকের বা ১৭৫১ শকের ৬ ভাদ্রে ব্রাহ্মণবিদায় হয় নাই, কারণ তখনও ব্রাহ্মসমাজরূপে কিছুই দাঁড়ায় নাই। কিন্তু ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রামমোহন রায়ের সমক্ষেই ব্রাহ্মণবিদায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাই পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বজায় রাখা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের বৃত্তান্তে বলেন যে, (১৭৮৭—অগ্রহায়ণ দেখ) "কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।" এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ১৭৫০এর ভাদ্রে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের মূল রোপিত হয়; তথাপি ১১ মাঘে উহা উক্ত বাড়ী হইতে সমূলে উত্তোলিত হইয়া বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় রোপিত হয়। সেই বৃক্ষই প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণে রামমোহন রায়ের শিষ্য শিবচন্দ্র দেবপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক ব্যক্তি অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ঐ ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাদিবসরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহারা সকলেই যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘকে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ভুল করিয়াছেন, আমরা তাহা মনে করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। শত শত বীজ ছড়াইয়া দিলেও তাহার কোনটী হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষকে যেদিন পৃথকরূপে রোপিত করা হয়, সেই দিনই বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ধরা হয়। আমাদের মনে হয়, এই শতবার্ষিকের বৎসর লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদবিতর্ক আনয়ন না করিয়া সকলের সদ্ভাবে মিলিতভাবে বৎসর স্থির করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পূরিয়া—আড়াঠেকা।

১ম গান

থরে থরে ফুটিল রে
কুসুম মুঞ্জরিয়া
নব রূপ নব ঢঙ্গ ;
নব গীত জাগে চিতে অনুখন—
চাহি আকুল তোমারি সঙ্গ ॥

২য় গান

কোলে লহ জননী হে
নয়ন দু' বহিয়া
ঝরে বারি মহাতঙ্কে।
কর দূর ভয়, ভয়নিবারণ
মোরে রাখিয়া তোমারি সঙ্গে ॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১ ২´ ৩ [ঋসসা] ॥

সন্‌া | ঋা ন্‌া ধক্ষ্‌া ধক্ষ্‌া I সা -া সা সা | জ্ঞা ন্‌া সা ঋা | সা -া -া ন্‌া |
(১) থ॰ ॰ রে থ ॰॰ ॰ ॰ রে ফু টি ॰ ॰ ল রে ॰ ॰ কু
(২) কো॰ ॰ লে ল ॰॰ ॰ ॰ হ জ ন ॰ ॰ নী হে ॰ ॰ ন

১ ২´ ৩

| সা গা -া -া I ক্ষা -া ধা ক্ষা | গা -া ঋা -া | সা -া -া ন্‌া |
(১) সু ম ॰ ॰ মু ॰ ॰ ঞ্জ রি ॰ ॰ ॰ য়া ॰ ॰ ন
(২) য় ন ॰ ॰ দু' ॰ ॰ ব হি ॰ ॰ ॰ য়া ॰ ॰ ঝ

১ ২´ ৩

| ঋা গা -া -া I ক্ষা -া -া -া | ধা না ধক্ষা -া | গা -া -া -া |
(১) ব রূ ॰ ॰ প ॰ ॰ ॰ ॰ ন ব ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
(২) রে বা ॰ ॰ রি ॰ ॰ ॰ ॰ ম হা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১ [সা -া ন্‌সা] ২´ ৩

| -া -া সা সা | ক্ষা ক্ষা ক্ষা গা | -া -া ঋা -া | সা -া -া II
(১) ॰ ॰ ঢ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ঙ্গ ॰ ॰
(২) ॰ ॰ ত ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ঙ্কে ॰ ॰

১ ২´ ৩

{গা | গা ক্ষধা নর্সা র্সা I র্ঋা না র্সা -া | -া -া র্সা -া | -া -া -া র্সা |
(১) ন ব গী॰ ॰॰ ত জা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ গে ॰ ॰ ॰ ॰ চি
(২) ক র দূ॰ ॰॰ র ভ ॰ ॰ ॰ ॰ য় ॰ ॰ ॰ ॰ ভ

১ ২ ৩

| র্সনা ধক্ষা -া ধা I না -া -া -া | র্ঋা না ধক্ষা -া | গা -া -া} ন্‌া
(১) তে অ ॰ ॰ নু ॰ ॰ ॰ ॰ খ ন ॰ ॰ ॰ ॰ চা
(২) য় নি ॰ ॰ বা ॰ ॰ ॰ ॰ র ণ ॰ ॰ ॰ ॰ মো

১ ২´ ৩ •
| সা গা -া গা I *ক্ষা *ক্ষা -া না | ধা ক্ষা -া গা | -া -া ঋা -া |
(১) • হি • আ কু ল • • তো মা • • • • • •
(২) • রে • রা খি যা • • তো মা • • • • • •

১ ২´ ৩ •
| সা -া সা সা I ক্ষা ক্ষা ক্ষা গা | -া -া ঋা -া | সা -া -া IIII
(১) রি • স • • • • • • • • • ঙ্গ • •
(২) রি • স • • • • • • • • • ঙ্গে • •

* পুরো মধ্যম ও কড়ি মধ্যমের মধ্যবর্ত্তী স্থিত শ্রুতি লাগিবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

বুদ্ধের ভাবপরিবর্ত্তন।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

বাৎসরিক হলকর্ষণোৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ-গৌতমের বয়স তখন দ্বাদশ মাস। রাজা-রাজন্য, স্ত্রী-পুরুষ সকলে উৎসবার্থে ক্ষেত্রে উপস্থিত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলপরিচালন। রাজা স্বহস্তে আপনার স্বর্ণলাঙ্গল পরিচালন করিলে পর, রাজন্যবর্গ স্ব স্ব রৌপ্যলাঙ্গলসহ তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তদনন্তর সাধারণ কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা-মূলক চাষক্রিয়া প্রদর্শিত হইত। শিশু গৌতমকেও উৎসবক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অদূরে একটি জম্বুবৃক্ষতলে মনোরম পালঙ্কে তিনি শায়িত। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহু সুদর্শনা ধাত্রী নিযুক্তা রহিয়াছে। কিন্তু উৎসব আরম্ভ হইতেই তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উৎসবক্ষেত্রে গমন করিল। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ধাত্রীগণ ফিরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল শিশু আসনাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ও ধ্যানমগ্ন! ওদিকে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িলেও জম্বুবৃক্ষের ছায়া স্থির থাকিয়া শিশুকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে তাহারা মহারাজকে এই সংবাদ দিল। মহারাজ শুদ্ধোদন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বিতীয়বার শিশুর পদে প্রণত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধার্থ-গৌতম দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। গৌতম রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, রাজন্যবর্গের মনে এই কথাই বিশেষভাবে জাগরিত ছিল। তাঁহারা ভবিষ্যতে লাভের আশায় আপন আপন পুত্র ও স্বজন-পুত্রগণকে কুমারের সহচর করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ রাজকুমার সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে যাহাই কল্পনা করুন না কেন, পিতা শুদ্ধোদনের মনে কিন্তু পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া দিতেছিল। শৈশব অতিক্রম করামাত্রই নিমিত্তজ্ঞ জ্যোতিষাচার্য্যগণের আবার ডাক পড়িল। কোন্ কোন্ কারণ ঘটিলে পুত্রের সংসারত্যাগের সম্ভাবনা জন্মিতে পারে, এইবার তাহার মীমাংসা আবশ্যক। জানা গেল, সংসারত্যাগের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপে গৌতম চারিটি দৃশ্য দেখিবেন—একটি জরাগ্রস্ত মানুষ, একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোক, একটি মৃতদেহ এবং একজন ভিক্ষু। *

শুদ্ধোদনের এখন হইতে প্রধান লক্ষ্য হইল এই চারিটি দৃশ্য যাহাতে কোনক্রমে গৌতমের দৃষ্টিপথে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহাকে বিবাহবদ্ধ করিয়া সংসারমোহে আকৃষ্ট করা। কুমারের জন্য মনোরম প্রাসাদ-ভবন নির্ম্মিত হইল। এই চতুর্দৃশ্যের অপসারণ কল্পে চারিদিকে অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত রহিল।

গৌতমের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, শুদ্ধোদন তখন তাহার উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। শাক্য সুপ্রবুদ্ধের † কন্যা যশোধরার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ-

---

* অপর মতে নামকরণের সময় যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারাই এই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। See—Manual of Buddhism—H. Kern, p. 14. Buddha and the Gospel of Buddhism—A. Coomerswami—p. 16; and Manual of Buddhism—Spence Hardy—p. 154.

† কাহারো মতে সুপ্রবুদ্ধ কোলিয়রাজ। কিন্তু তাঁহার অনু-

ভাবে আকৃষ্ট হইল। তথাপি পুত্রের মনোভাব পরীক্ষার জন্য তিনি একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। কুমার কর্তৃক সমাগত শাক্যকুমারীগণকে রত্নবিতরণ, উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাসময়ে বিতরণ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। শাক্যকুমারীগণ একে একে উপহার লইয়া যাইতে লাগিল। উপহারসামগ্রী নিঃশেষ হইল; ব্রীড়াযুক্তা যশোধরা ধীর পদসঞ্চারে সকলের শেষে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌতম সসঙ্কোচে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। উভয়ে মৃদু বাক্য-বিনিময় হইল। পরক্ষণেই কুমার তাহাকে আপন অঙ্গুরীয় উপহার দিলেন। মহারাজা সংবাদ পাইয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

শুদ্ধোদন যথারীতি সুপ্রবুদ্ধের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সুপ্রবুদ্ধ উত্তরে জানাইলেন যে খ্যাতি-সম্পন্ন বীর ব্যতীত তাঁহার পরিবার কাহারো সহিত বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করেন না। বিলাসী গৌতমের বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছুই তিনি অবগত নহেন। ব্যর্থতার গ্লানি শুদ্ধোদনের অন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। এসংবাদ অবগত হইয়া গৌতম স্বীয় বীর্য্য-কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য সকল শাক্যগণকে অবিলম্বে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতে মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। শুদ্ধোদন দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুমারের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। এক শুভদিনে শাক্যগণ একত্রিত হইলেন,—যত শাক্য-বীরগণ কুমারের বীর্য্যদম্ভ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইলেন। শুদ্ধোদনের শঙ্কা দূর করিয়া, এবং সমগ্র শাক্যকুলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া গৌতম একে একে সকল বীরগণকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ম্লান-জ্যোতি করিয়া দিলেন—কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শিল্প ও চৌষট্টী কলায়ও তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা প্রমাণিত করিয়া উপস্থিত সকলকে গৌতম এককালে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।* সুপ্রবুদ্ধের আর কোনও আপত্তি রহিল না। মহা সমারোহে গৌতম ও যশোধরার পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

পরমানন্দে গৌতমের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহু রূপসী নর্ত্তকী নিযুক্ত হইল। কোনরূপ চিন্তার অবসর না দিবার জন্য উহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে নৃত্যগীতে প্রফুল্ল রাখিতে প্রয়াস পাইত।

দেখিতে দেখিতে অষ্টাদশ বর্ষ আমোদপ্রমোদে কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বকে আত্মবিস্মৃত দেখিয়া দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

উদ্যানভবনে এইরূপ বিলাসিতার মধ্যে সমস্ত দিন-যামিনী ডুবিয়া থাকিয়া গৌতমের ক্রমে বিরক্তি ধরিতে লাগিল। তিনি একদিন রথে বহির্ভ্রমণে বাহির হইলেন। রথ কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তিনি দেখিলেন একটি দন্তহীন পককেশ জরাগ্রস্ত লোক, কম্পান্বিত-কলেবরে যষ্টিভর করিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতমের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার সারথিকে প্রশ্ন করিলেন—

"এ কী ছন্দক?"

"একটি জরাগ্রস্ত লোক।"

"ইহার কি এই ভাবেই জন্ম হইয়াছে?"

"না। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদের মতই ছিল।"

"জগতে এরূপ আরো আছে কি?"

"বিস্তর আছে।"

"আমাকেও জরাগ্রস্ত হইতে হইবে কি?"

"হাঁ কুমার, সকলকেই হইতে হয়।"

গৌতম আর অগ্রসর হইলেন না, তিনি চিন্তিতমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্যাপার শুনিয়া শুদ্ধোদন বিষম ভাবিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল দৃশ্য কুমারের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরে রাখিবার জন্য তিনি কত শাস্ত্রী-সামন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাপি এ কি ঘটিল! দেবগণের একজনই যে বৃদ্ধবেশে গৌতমের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, শুদ্ধোদন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বহু সান্ত্বনাবাক্যে তিনি কুমারকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া অধিক সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এইবারে আর কোন দৃশ্য গৌতমের দৃষ্টিপথে পড়া সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

প্রায় চারিমাস পরে গৌতম আর একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দেবগণ সুযোগ হারাইলেন না। রোগে-তাপে অভিভূত, জীর্ণশীর্ণ ব্যাধিগ্রস্তরূপে* একজন আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করিয়া ব্যাধি শরীরধর্ম্ম জানিতে পারিয়া গৌতম বিষণ্ণচিত্তে

ত্যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী আচরণ (বুদ্ধের প্রতি) দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

* ললিতবিস্তরের মতে সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণ প্রণীত বুদ্ধদেব ৬৬ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

* অপর মতে গলিত কুষ্ঠরোগীরূপে। See—Manual of Buddhism—Hardy—pp. 188.

ফিরিয়া আসিলেন—আর অগ্রসর হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শুদ্ধোদন সংবাদ পাইয়া এইবারে প্রহরীসংখ্যা দ্বিগুণিত করিলেন।

কিছুকাল পরে গৌতম আবার একদিন পূর্ব্ববৎ নগর-বিহারে বহির্গত হইলেন। এই দিনও এক দেবতা মৃত-দেহরূপে উদ্যানপথে পড়িয়া রহিলেন। প্রহরী-শাস্ত্রী কেহই দেখিতে পাইল না, দেখিলেন শুধু গৌতম ও ছন্দক। গলিত মৃতদেহোপরি অসংখ্য কীটের পৈশাচিক ভোজব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গৌতমের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। 'প্রত্যেক মানবকেই মরিতে হইবে'—দেবপ্রভাবাভিভূত ছন্দকের মুখে এই উত্তর শুনিয়া তিনি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সংবাদ শূলের মত শুদ্ধোদনকে বিদ্ধ করিল। প্রবল ভবিতব্যের সহিত আপনার দুর্ব্বল মানুষী শক্তির তুলনা করিয়া মানুষের মতই তিনি সহায়হীনতার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার মানুষেরই মত হৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আশার শেষ অবলম্বনটুকুর ত্যাগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আর একটি মাত্র দৃশ্য বাকী! রাজধানীর আট ক্রোশের ভিতরে যাহাতে কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি অশান্ত-উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অদৃষ্টবাদী ভারতবাসীর অদৃষ্টে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিবার জন্যই যেন শুদ্ধোদনের সমস্ত যত্নপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! জন্মতিথি বৈশাখীপূর্ণিমাদিনে গৌতম ছন্দক সহ পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইতেই দেখিলেন এক গৈরিক-ধারী ভিক্ষু। তাঁহার শান্ত-সংযত দৃষ্টি, তাঁহার মৃদুমন্থর-গতিভঙ্গিমা, তাঁহার উজ্জ্বল মুখকান্তি গৌতমের চিত্ত অধিকার করিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

> কিং সারথে পুরুষঃ শান্তঃপ্রশান্তচিত্তো
> নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্র্জতে যুগমাত্রদর্শী।
> কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
> পাত্রং গৃহীত্বা ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥

সারথি, শান্ত প্রশান্তচিত্ত কে এ গৈরিকধারী পুরুষ? ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। চক্ষু ইঁহার উৎ-ক্ষিপ্ত নহে। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ইনি কে?

সারথি ছন্দক উত্তর দিল—

> এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
> অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
> প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো
> সংরাগদ্বেষবিগতো তিষ্ঠতিপিণ্ডচর্য্যা॥

দেব, ইনি ভিক্ষু। কামরতি অপহার করিয়া ইনি বিনয়সম্পন্ন হইয়াছেন। রাগ-দ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাজীবী ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন।*

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত আতুর ও গলিত মৃতদেহ দর্শন করিবার পর হইতে উত্তরোত্তর গৌতমের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মন চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, আজ এই প্রশান্তবদন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি উদ্যান-বাটীতে যাইয়া সমস্তদিন জলক্রীড়া ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলেন। অপরাহ্নে সংবাদ আসিল যশোধরার গর্ভে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করি-য়াছে। তাঁহার অন্তর ছাপিয়া উচ্ছ্বাস উঠিল—"'রাহুল-জাতো', 'আমার একটি বন্ধন জন্মিয়াছে'।" নবজাত শিশুর নাম রাহুল রাখা হইল। গৌতমের মনে পুত্রের মুখদর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগিল। তিনি রথারূঢ় হইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। কিসা-গৌতমী নাম্নী এক শাক্যরমণী গবাক্ষপথে অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত রথারূঢ় গৌতমকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—

> নিব্বুতা নূন সা মাতা
> নিব্বুতা নূন সো পিতা;
> নিব্বুতা নূন সা নারী,
> যস্স-যন্ ঈদিসো পতি। †

'নিব্বুতা' শব্দ শ্রবণ মাত্রই গৌতমের 'নিব্বুতি', নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ মনে পড়িল। পুত্রদর্শনেচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার মনে নির্ব্বাণলাভেচ্ছাই প্রবলতর হইয়া উঠিল। তিনি কিসা-গৌতমীকে বহুমূল্য মণিহার গুরুদক্ষিণাস্বরূপে প্রেরণ করিলেন। অল্পবুদ্ধি কুমারী ভাবিলেন গৌতম তৎপ্রতি প্রণয়যুক্ত হইয়াছেন।

গৌতমীর মনে যাহাই হউক না কেন, গৌতমের সমস্ত অন্তঃকরণ তখন একমাত্র নির্ব্বাণচিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপন পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। অসংখ্য নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গীত সেদিন তাঁহার শ্রবণে মধুবর্ষণ করিল না, সুন্দরী নর্ত্তকীগণের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী তাঁহার চক্ষে

* 'ললিতবিস্তর' হইতে এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইল। ললিত-বিস্তরের মত বর্ত্তমান গ্রন্থে অনুসৃত হয় নাই। তবে পালি মতের সহিত এই স্থানে কোন অসামঞ্জস্য নাই বলিয়া এবং ললিতবিস্তরের এই অংশের বিবরণের সৌষ্ঠবদৃষ্টে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। ললিতবিস্তরের বিবরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণের পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে; ললিতবিস্তরের ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা নহে। 'দীঘনিকায়' মতে চারিটি দৃশ্য গৌতম একই দিনে দেখিয়াছিলেন।

† ধন্য ইঁহার পিতা, ধন্যা ইঁহার মাতা, ধন্যা সেই নারী যাঁহার ঈদৃশ পতি।

প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিছুই আজ তাঁহার ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশাধিকার পাইল না। ধীরে ধীরে গৌতমের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ব্যর্থতার গ্লানি বহিয়া পরিশ্রান্ত নর্ত্তকীগণ একে একে যত্র তত্র অসংযতভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ।

[আমরা বড়ই আনন্দের সহিত বংশবাটীর রাজ-পরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি (হুগলী "বরফডাঙ্গার মাঠ" সম্বন্ধীয়) প্রকাশ করিলাম। এই পত্র হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, পত্রিকার প্রবন্ধাদি পত্রলেখকের ন্যায় মনীষীগণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তং সং]

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

বিগত আষাঢ়-সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ৯১ পৃষ্ঠা "বঙ্গে বরফ-বার্ত্তা"য় হুগলীর যে মাঠে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা এখনও আছে কি না লেখক তাহা জানেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার ও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে হুগলীর "বরফডাঙ্গা"র মাঠে এখন বরফ প্রস্তুত না হইলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা আমার বহুকালের পৈত্রিক জমিদারী মৌজা কুলীহান্দার অন্তর্গত। এই মহলটী হুগলী রেলষ্টেসনের পশ্চিম মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী সহরের গঙ্গার ধার বাবুগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী রেল ষ্টেসন হইতে চুঁচুড়া রেল ষ্টেসনের ধারে যে মাঠ আছে তাহার মধ্যে "বরফডাঙ্গার" মাঠ অবস্থিত। বরফের কল যখন ছিল না ও আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া বড় বড় বরফের চাঙ্গড় যখন আমদানি হইত না, সে সময় এই "বরফ ডাঙ্গার" প্রস্তুত বরফ আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ভাগ্যবন্তগণ ব্যবহার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এখানে বরফ প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। যে প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা আড়ম্বরশূন্য হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। এক শ্রেণীর লোক বরফ প্রস্তুত প্রণালী জানিত, তাহাদের বংশেই এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। বিদেশের আমদানী বরফ ও কলজাত বরফ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বরফডাঙ্গা মাঠের বরফপ্রস্তুত শিল্পও লোপ পাইয়াছে। বাষ্টীড্ সাহেবের "প্রাচীন কলিকাতার প্রতিধ্বনি" পুস্তকে হুগলী বরফডাঙ্গা মাঠের এইরূপ উল্লেখ আছে:—"সেকালে মুখোষ পরিধান করিয়া আমোদপ্রমোদের খুব প্রচলন ছিল; নৃত্যাদির ছদ্মবেশ ও পুরুষের মেয়েলি পোষাক ভাড়া প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইত; বস্তুতঃ উদ্দাম আনন্দপ্রবাহ প্রচণ্ড ভাবেই চলিত, পরিশেষে নৈশ ভোজের সময় শীতকালে টাট্‌কা অইষ্টার মৎস্য ও বরফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কুমারী গোল্ডবোর্ণ বলেন যে গঙ্গার দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীর ধার হইতে বরফ আসিত; সম্ভবতঃ তিনি হুগলীর নিকটে সেই সময়ের ও তাহার পরবর্ত্তী কালের বরফমাঠের কারখানার কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" *

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়।

(বাঁশবেড়িয়া, জেলা হুগলী)

প্রতিবাদ।

মাননীয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশে অদ্ভুত নব্য রসসাহিত্যের অতিপ্রচলনকালে অমৃতসমান মহাভারতের কথা লিখিতেছি, তাহা কে-ই বা পড়িবে, কে-ই বা শুনিবে? ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

গত আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। সুখী এই জন্য যে আমার প্রবন্ধ অন্ততঃ একজন শিক্ষিত যুবকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া; আর আনন্দিত এই জন্য যে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবক হইয়াও ক্ষেমেন্দ্রবাবু মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া। ভরসা করি যে তাঁহার সদ্দৃষ্টান্ত অন্যান্য

---

* Masquerades were a very common means of amusement in the old days; dominoes were advertised for hire, also various female costumes for gentlemen; and evidently the fun raged fast and furious. They generally wound up with suppers, at which in the cold weather, fresh oysters and ices were to be had in abundance. Miss Goldborne says the ice came from "some slender inland rivulets of the Ganges," by which she probably meant to indicate the "ice fields" that were worked near Hooghly then and much later.—" Echoes from Old Calcutta by H. E. Busteed, p. 127.

যুবজনেরও অনুকরণীয় হইবে এবং তাঁহারাও সকলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় নিজেরাও আনন্দলাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকলের আলোচনার ফলে আর্য্যজাতির অতীত অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এক্ষণে ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিয়ে দিলাম। আশা করি ইহা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রতিবাদ (১) সম্বন্ধে:—

অ

মহাভারত—আদি, সম্ভব—১১৯ অধ্যায় মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডু—

(ক) পত্নীদিগকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে কহিতে বলিলেন যে—"পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না।" পাণ্ডুর পত্নীদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তনে রাজি না হইয়া যে কোনও অবস্থাতেই স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সমীপে থাকিতে চাহিলেন।

(খ) তখন পাণ্ডু নিজের ও পত্নীদের আভরণ ও বস্ত্রাদি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।"

উক্ত ১১৯ অধ্যায়ে পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা আমার কল্পিত নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রকার ভ্রমবশতঃ উক্ত reference প্রকাশ না হওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রবাবুর মনে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়া থাকিবে।

ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ হওয়ায় reference অভাব নিমিত্ত আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি পূরণ করিবার সুযোগ পাইয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আ

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্রবাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতে কিন্তু তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) "ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিদুরকে মহাত্মা ভীষ্ম জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ....উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্যবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

"তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুক....... ছিলেন"। (মহা—আদি, সম্ভব, ১০৯ অধ্যায়)।

(খ) কুন্তীর স্বয়ম্বরকালে—কুন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন "তথায়......মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ" পাণ্ডুকে, তাঁহার "প্রতাপ সিংহসম, বক্ষোদেশ কপাটোপম......কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরস্তে বরণ করিলেন। দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ ...... প্রস্থান করিলেন।"

[মহা—আদি, সম্ভব, ১১২ অধ্যায়]

(গ) মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৩ অধ্যায়ে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় বর্ণিত আছে তথায় পাণ্ডুর শৌর্য্য বীর্য্য কহিয়া কবি তাঁহাকে "অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী" আখ্যা দিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্য যে খারাপ তাহা সম্ভবপর কি?

জন্মাবধি যিনি তৎকালীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিতে সুনিপুণ ও অদ্বিতীয় ধানুক হইয়াছিলেন, যাঁহাকে কুন্তী বরমাল্য দেওয়াতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ "দ্বন্দে মাতনম্" অপেক্ষা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, যিনি অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী বীর ছিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল, ইহা মহাভারতের কোন্ অংশ হইতে মনে হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।

ই

পাণ্ডুর জন্মাবধি মন্দ স্বাস্থ্যের অনুমান সমর্থনের জন্য তাঁহার মৃত্যুর প্রণালী যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদে, তাহা মহাভারতের উপরি উদ্ধৃত ও অন্যান্য অংশে সমর্থিত হয় না।

"স্বাস্থ্যলাভার্থ বনগমন" কল্পনা মাত্র। ইহার বিপরীত কথাই মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৪ অধ্যায় যেখানে পাণ্ডুর বনগমন প্রথম উল্লেখ আছে—তদধ্যায়ে জানা যাইবে যে বনে গিয়া পাণ্ডু সর্ব্বদা খড়্গহস্ত ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া মৃগয়াতে ও পত্নীদ্বয়ে আসক্ত রহিতেন।

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৮ এবং ১২০ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে মুনিশাপে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ১২৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কনিষ্ঠা পত্নীকে বলাৎকার করিতে গিয়াই পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে—বলা যাইতে পারে যে পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীর্য্য যেরূপ অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (১০২ অধ্যায়) সেরূপ বনে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু পাণ্ডুও অপত্যোৎ-

প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিছুই আজ তাঁহার ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশাধিকার পাইল না। ধীরে ধীরে গৌতমের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ব্যর্থতার গ্লানি বহিয়া পরিশ্রান্ত নর্ত্তকীগণ একে একে যত্র তত্র অসংযতভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ।

[আমরা বড়ই আনন্দের সহিত বংশবাটীর রাজ-পরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি (হুগলী "বরফডাঙ্গার মাঠ" সম্বন্ধীয়) প্রকাশ করিলাম। এই পত্র হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, পত্রিকার প্রবন্ধাদি পত্রলেখকের ন্যায় মনীষীগণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তং সং]

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

বিগত আষাঢ়-সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ৯১ পৃষ্ঠা "বঙ্গে বরফ-বার্ত্তা"য় হুগলীর যে মাঠে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা এখনও আছে কি না লেখক তাহা জানেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার ও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে হুগলীর "বরফডাঙ্গা"র মাঠে এখন বরফ প্রস্তুত না হইলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা আমার বহুকালের পৈত্রিক জমিদারী মৌজা কুলীহান্দার অন্তর্গত। এই মহলটী হুগলী রেলষ্টেসনের পশ্চিম মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী সহরের গঙ্গার ধার বাবুগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী রেল ষ্টেসন হইতে চুঁচুড়া রেল ষ্টেসনের ধারে যে মাঠ আছে তাহার মধ্যে "বরফডাঙ্গার" মাঠ অবস্থিত। বরফের কল যখন ছিল না ও আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া বড় বড় বরফের চাঙ্গড় যখন আমদানি হইত না, সে সময় এই "বরফ ডাঙ্গার" প্রস্তুত বরফ আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ভাগ্যবন্তগণ ব্যবহার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এখানে বরফ প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। যে প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা আড়ম্বরশূন্য হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। এক শ্রেণীর লোক বরফ প্রস্তুত প্রণালী জানিত, তাহাদের বংশেই এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। বিদেশের আমদানী বরফ ও কলজাত বরফ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বরফডাঙ্গা মাঠের বরফপ্রস্তুত শিল্পও লোপ পাইয়াছে। বাষ্টীড্ সাহেবের "প্রাচীন কলিকাতার প্রতিধ্বনি" পুস্তকে হুগলী বরফডাঙ্গা মাঠের এইরূপ উল্লেখ আছে:—"সেকালে মুখোষ পরিধান করিয়া আমোদপ্রমোদের খুব প্রচলন ছিল; নৃত্যাদির ছদ্মবেশ ও পুরুষের মেয়েলি পোষাক ভাড়া প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইত; বস্তুতঃ উদ্দাম আনন্দপ্রবাহ প্রচণ্ড ভাবেই চলিত, পরিশেষে নৈশ ভোজের সময় শীতকালে টাট্‌কা অইষ্টার মৎস্য ও বরফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কুমারী গোল্ডবোর্ণ বলেন যে গঙ্গার দুরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীর ধার হইতে বরফ আসিত; সম্ভবতঃ তিনি হুগলীর নিকটে সেই সময়ের ও তাহার পরবর্ত্তী কালের বরফমাঠের কারখানার কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" *

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়।
(বাঁশবেড়িয়া, জেলা হুগলী)

প্রতিবাদ।

মাননীয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশে অদ্ভুত নব্য রসসাহিত্যের অতিপ্রচলনকালে অমৃতসমান মহাভারতের কথা লিখিতেছি, তাহা কে-ই বা পড়িবে, কে-ই বা শুনিবে? ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

গত আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। সুখী এই জন্য যে আমার প্রবন্ধ অন্ততঃ একজন শিক্ষিত যুবকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া; আর আনন্দিত এই জন্য যে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবক হইয়াও ক্ষেমেন্দ্রবাবু মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া। ভরসা করি যে তাঁহার সদৃষ্টান্ত অন্যান্য

---

* Masquerades were a very common means of amusement in the old days; dominoes were advertised for hire, also various female costumes for gentlemen; and evidently the fun raged fast and furious. They generally wound up with suppers, at which in the cold weather, fresh oysters and ices were to be had in abundance. Miss Goldborne says the ice came from "some slender inland rivulets of the Ganges," by which she probably meant to indicate the "ice fields" that were worked near Hooghly then and much later.—" Echoes from Old Calcutta by H. E. Busteed, p. 127.

যুবজনেরও অনুকরণীয় হইবে এবং তাঁহারাও সকলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় নিজেরাও আনন্দ-লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকলের আলোচনার ফলে আর্য্যজাতির অতীত অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এক্ষণে ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে দিলাম। আশা করি ইহা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রতিবাদ (১) সম্বন্ধে :—

অ

মহাভারত—আদি, সম্ভব—১১৯ অধ্যায় মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডু—

(ক) পত্নীদিগকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে কহিতে বলিলেন যে—"পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না।" পাণ্ডুর পত্নীদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তনে রাজি না হইয়া যে কোনও অবস্থাতেই স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সমীপে থাকিতে চাহিলেন।

(খ) তখন পাণ্ডু নিজের ও পত্নীদের আভরণ ও রত্নাদি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।"

উক্ত ১১৯ অধ্যায়ে পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা আমার কল্পিত নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রকার ভ্রমবশতঃ উক্ত reference প্রকাশ না হওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রবাবুর মনে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়া থাকিবে।

ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ হওয়ায় reference অভাব নিমিত্ত আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি পুরণ করিবার সুযোগ পাইয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আ

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্রবাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতে কিন্তু তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) "ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিদুরকে মহাত্মা ভীষ্ম জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ....উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্যবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

"তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুক....... ছিলেন"। (মহা—আদি, সম্ভব, ১০৯ অধ্যায়)।

(খ) কুন্তীর স্বয়ম্বরকালে—কুন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন "তথায়......মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি-শ্রেষ্ঠ" পাণ্ডুকে, তাঁহার "প্রতাপ সিংহসম, বক্ষোদেশ কপাটোপম......কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরস্রে বরণ করিলেন। দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ ...... প্রস্থান করিলেন।"

[মহা—আদি, সম্ভব, ১১২ অধ্যায়]

(গ) মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৩ অধ্যায়ে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় বর্ণিত আছে তথায় পাণ্ডুর শৌর্য্য বীর্য্য কহিয়া কবি তাঁহাকে "অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী" আখ্যা দিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্য যে খারাপ তাহা সম্ভবপর কি?

জন্মাবধি যিনি তৎকালীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিতে সুনিপুণ ও অদ্বিতীয় ধানুক হইয়াছিলেন, যাঁহাকে কুন্তী বরমাল্য দেওয়াতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ "দ্বন্দ্বে মাতনম্" অপেক্ষা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, যিনি অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী বীর ছিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল, ইহা মহাভারতের কোন্ অংশ হইতে মনে হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।

ই

পাণ্ডুর জন্মাবধি মন্দ স্বাস্থ্যের অনুমান সমর্থনের জন্য তাঁহার মৃত্যুর প্রণালী যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদে, তাহা মহাভারতের উপরি উদ্ধৃত ও অন্যান্য অংশে সমর্থিত হয় না।

"স্বাস্থ্যলাভার্থ বনগমন" কল্পনা মাত্র। ইহার বিপরীত কথাই মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৪ অধ্যায় যেখানে পাণ্ডুর বনগমন প্রথম উল্লেখ আছে—তদধ্যায়ে জানা যাইবে যে বনে গিয়া পাণ্ডু সর্ব্বদা খড়্গহস্ত ও ধনুর্ব্বাণ-ধারী হইয়া মৃগয়াতে ও পত্নীদ্বয়ে আসক্ত রহিতেন।

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৮ এবং ১২০ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে মুনিশাপে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ১২৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কনিষ্ঠা পত্নীকে বলাৎকার করিতে গিয়াই পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে—বলা যাইতে পারে যে পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীর্য্য যেরূপ অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (১০২ অধ্যায়) সেরূপ বনে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু পাণ্ডুও অপত্যোৎ-

পাদনশক্তি বিরহিত হইয়াছিলেন। মুনিশাপের কথা—হেতু প্রদর্শন মাত্র—তাহা গল্প হইতে পারে।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেই লোকে তল্লাভার্থ বায়ুপরিবর্ত্তনে (changeএ) যায়। মহাভারতের বর্ণনামতে বনগমনকালে বা তাহার পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুর ভগ্নস্বাস্থ্যের কোনই বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমার মনে হয় স্বাস্থ্যলাভার্থ পাণ্ডুর বনগমন করার অনুমান ঠিক নহে।

প্রতিবাদ (২) সম্বন্ধে :—

এই প্রতিবাদে যুধিষ্ঠিরের দাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আমার মতামত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিব।

এক্ষণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে "একই পরিবারভুক্ত" শব্দ দ্বারা উক্ত প্রতিবাদে যদি একান্নবর্ত্তীতার কল্পনা করা হইয়া থাকে তবে তাহা যে ভুল তাহাও উক্ত ভিন্ন প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

ক্ষেমেন্দ্র বাবু অনুমান করিয়াছেন যে "একই পরিবাররূপে গণ্য হওয়াতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ একই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন" ইত্যাদি।

একই আচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইলেই কি একই পরিবারভুক্ত বা একান্নবর্ত্তী হয়?

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রত্যেকেই পরশুরামের শিষ্য ছিলেন—মহাভারতেই দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া কি ইঁহারা একই পরিবারভুক্ত ছিলেন বলা যায়?

পুনশ্চ—মহা, আদি, সম্ভব ১৩২ অধ্যায়ে দেখা যায়, "আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সুতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থ দেশদেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন।"

ঐ—আদি, চৈত্ররথ, ১৬৭ অধ্যায়ের শেষে দৃষ্ট হইবে 'প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চাল দেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং……ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।" সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নও—দ্রোণশিষ্য।

ঐ—দ্রোণপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়ে জানা যায় যে বহুদেশীয় "রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব শস্ত্রের নিমিত্ত" দ্রোণাচার্য্যের "উপাসনা করিতেন।" এবং "সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা" ছিল।

একই দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বিধায় ইঁহারাও সকলেই কি তাহা হইলে "একই পরিবারভুক্ত" ছিলেন? ক্ষেমেন্দ্র বাবু "প্রতিবাদে" reference গুলি দিলে সুখী হইতাম।

প্রতিবাদ (৩) সম্বন্ধে :—

এই সংখ্যক প্রতিবাদের উত্তর উক্ত পত্রিকার আষাঢ়-সংখ্যাতেই প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাংশে দৃষ্ট হইবে। বোধ করি যখন "প্রতিবাদ" লিখিত হয় তখন ঐ প্রবন্ধাংশ ক্ষেমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আশা ও ভরসা করি প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি যে আলোকে ও অন্তরের সহিত লিখিত হইল সেই ভাবেই ইহা গৃহীত হইবে; এবং ইহা লেখার জন্য ধৃষ্টতা হইয়া থাকিলে স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তিনি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ।

নানা কথা।

অশ্লীল ছবি—সেদিন কলেজ মার্কেটের সম্মুখে ফুটপাথে চলিতেছি, এমন সময়ে, একটী লোক Paris pictures চাই বলিয়া হাঁকিতেছিল। আমি দেখিবার জন্য বলিলাম যে, পুলিশে যদি ধরে। তখন সে স্পর্দ্ধা সহকারে বলিল যে পুলিশ কিছুই করিতে পারে না, যতক্ষণ আমি লেফাফার ভিতর বন্ধ করিয়া এই ছবিগুলি বিক্রয় করি। তার পর আমাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া একটা লেফাফা দেখাইয়া বলিল যে, উহার ভিতর বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অতীব অশ্লীল চিত্র আছে। যাক, যিনি এগুলি বিক্রয়ের জন্য বাহির করিয়াছেন, তিনি লেফাফার উপরে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় দিয়া ছাপা অক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কেহ ঐ সময়ের মধ্যে ছবিগুলি উপভোগ করিয়া অপছন্দ করেন ও ফেরত দিতে চান, তবে তাঁহাকে মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। এই সকল হইতে কি বুঝা যায়? মনে হয় না কি যে, প্রকাশক কেবল নিজের পকেট টাকায় ভরাইবার জন্য এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে, দেশবাসীর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এ প্রকার মনোভাবকে আমরা পশুভাবের অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চাহি না। আমরা আরও শুনিলাম যে প্রকাশক একজন বাঙ্গালী। আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের মধ্যে কেহ কি আমাদিগকে ঠিক করিয়া বলিয়া দিবেন, এইভাবে উক্ত ছবি সকল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে আইনের কবলে আনা যায় কি না? প্রকাশকের ঠিকানা আমরা জানি। যদি কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়গণ প্রকাশককে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে সম্মত থাকেন, তবে আমি তাহার ঠিকানা

প্রকাশ করিব। তাহার কি বালকবালিকা প্রভৃতির মনোভাব কলুষিত করিতে এতটুকু কষ্ট হয় না? প্রকাশক কি পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই? তাহার কি ভাইবোন নাই? ধিক তাহাকে। একদল লোক হইয়াছে, যাহারা দেশকে উৎসন্নদশায় মৃত্যুমুখে লইয়া চলিবার জন্য আড়েহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—নিজের পকেট পূর্ণ হইলেই হইল; বিলাতের মতামতের পদে পদে দোহাই দিয়া এদেশে অশ্লীল বিষয় চালাইতে দ্বিধা করে না। এ সকল ভাবিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, ফুকারিয়া কাঁদিতে চায় এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য ভগবানের নিকট দুবাহু বাড়াইয়া প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভিক্টর হিউগো ও নাস্তিকতা—নাস্তিকতা সম্বন্ধে হিউগো: বলেন—"নাস্তিক্য কি তুচ্ছ, কি হেয়, কি অযৌক্তিক! ঈশ্বর আছেন। আমি নিজের অস্তিত্বের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সুনিশ্চিত। প্রার্থনা যে আত্মার জন্য কি প্রকার আবশ্যক ও সুফলপ্রদ তদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সময় দিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিসাবে আমি প্রার্থনা না করিয়া ক্রমান্বয়ে চার ঘণ্টা কাটাইতে পারি না। ভগবানের কাছে আমি কি বিষয়ে প্রার্থনা করি? আমাকে শক্তি দিবার জন্য। ন্যায় ও অন্যায় আমি জানি, কিন্তু আমি দুর্ব্বল এবং আমার নিজের দুর্ব্বলতা বুঝি। যাহা ন্যায়, তদনুসারে আমার নিজের ক্ষমতায় কার্য্য করিতে অক্ষম,—একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে তুলিয়া ধরেন এবং রক্ষা করেন। তাঁহাতেই আমরা বাস করি—তাঁহার ভিতর দিয়াই আমরা জীবন লাভ করি, গতি এবং যাহা কিছু সকলই লাভ করি। তিনি universal creator (বিশ্বস্রষ্টা)। কিন্তু তিনি জগত সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলা ঠিক নয়। তিনি অনাদি অনন্ত কাল জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বিশ্বজগতের প্রাণ। তিনি অনন্তের ego বা আত্মা" (Liberty, ৩০-৬-২৯ দেখ)

আমাদের শাস্ত্রে ঠিক এই কথা বলিলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত যখন ইহা বলিয়াছেন তখন ইহা সহস্রবার মান্য!

দেবদাসী প্রথা রহিত—আঃ বাঁচিলাম। দেশ হইতে অন্তত একটী অত্যন্ত অনিষ্টকর কুপ্রথা দূর হইল। মাদ্রাজের বহু মন্দিরে একটী প্রথা সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। বহু নারী চিরদিন কুমারী অবস্থায় থাকিয়া এই সকল মন্দিরের সেবিকারূপে মন্দিরের সম্মুখে সঙ্গীত ও নৃত্য করিত। ফলে তাহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্র কলুষিত হইত। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার মহিলা ডেপুটী প্রেসিডেন্ট ডাঃ মুথু লক্ষ্মীর উপস্থাপিত একটী বিল গৃহীত হইবার ফলে এই পাপপ্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত হইল। আমরা ডাঃ শ্রীমতী মুথু লক্ষ্মীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। (সঞ্জীবনী ২০ আষাঢ় ১৩৩৬ দেখ)

বন্যা নিবারণের উপায়—গত ১৫ শ্রাবণের আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে চীন দেশের প্রাচীন পন্থা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বড়ই সময়োপযোগী। এই প্রবন্ধ হইতে (বিশেষত যখন ইহার মূল আমেরিকার Literary Digestএ প্রকাশিত হইয়াছে) প্রাচ্যগণ যে বন্যাপ্রতিবিধায়ক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। কিন্তু এই দেশে এই উপায় কি কার্য্যে লাগান হইবে? আমাদের অনুরোধ আনন্দবাজারসম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিয়া broadcast বিলি করুন।

বিলাতের মিল বন্ধ—কাগজে দেখি, প্রধানত প্রাচ্যদেশের খরিদ্দারের অভাবে ল্যাঙ্কাসায়ারে ১৮ শত মিল বন্ধ। দেশীয় অনেক সংবাদপত্রে ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশের ইঙ্গিত দেখি। সত্য কথা বলিতে কি, আমার এজন্য দুঃখই হইয়াছে। কারণ এই যে, এত বড় উন্নত জাতি ইংরাজেরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভুলিয়া গিয়া আমাদেরও কষ্ট দিতেছে এবং নিজেদেরও কষ্ট আনিতেছে। নিয়মটী এই যে, আঘাতের সমপরিমাণে প্রতিঘাত পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা যে পরিমাণে আঘাত পাইব, ইংরাজজাতি ভুলিয়া যান বা নাই যান, তাহাকে তদনুরূপ প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। আমাদের মন্ত্র হইতেছে live and let live—নিজে বেঁচে থাক এবং অপরকে বাঁচিতে দাও। ভগবানের মঙ্গল বিধানে ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসনে আসিয়াছে, ভাল কথা। ইংরাজ যদি নিজের ভাল চান, আমাদের ভাল নাই চান, তবু তাঁহাকে আমাদেরও প্রকৃত ভাল, প্রকৃত মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পনের আনা নয় পাই নিজের পকেটের দিকে চাহিয়া করিলে চলিবে না। হৃদয় খুলিয়া মঙ্গলবিধানে অগ্রসর হও—ভারতবাসীরও হৃদয় কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হইয়া পড়িবে। আঘাতের অনুরূপ প্রতিঘাত আসে এবং প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করে, এ সমস্ত নিয়ম জড়, মন ও অধ্যাত্ম রাজ্যে—প্রকৃতির সকল বিভাগেই কার্য্য করে দেখা যায়।

বস্ত্রের কথা—বিগত ১৮শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ভারতের লোকেরা চরকা কাটিত। ভারতের বস্ত্রও ইংলণ্ড ও ইউরোপে কোটি কোটি টাকার রপ্তানি হইত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ভারতে ৫ কোটী টাকারও কম বস্ত্র আমদানি হয়। ১৮৭৯ অব্দে ৭ কোটি টাকার কম

আমদানি হয়। ঐ সময়ে এদেশের চরকাকাটা সুতায় তৈরি কাপড়ের সঙ্গে ইংলণ্ডের কলের কাপড় হার মানিত। ১৮৭০ অব্দে মিঃ রিভার্ট কর্ণেল লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের কলনির্ম্মিত কাপড় দেশীয় কাপড়কে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের দেশে কেহ ভারতীয় কাপড় আমদানী করিলে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে জবরদস্তি করিয়া ও ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক বসাইয়া এদেশে বিলাতী বস্ত্র চালাইয়াছিলেন। আজ আমরা বৎসরে ৬৬ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি করিতেছি!

(আনন্দবাজার ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬)

এবিষয়ে আমরা—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥
পরবশ যাহা কিছু সকলি দুঃখের কারণ।
আত্মবশ যাহা কিছু সকলি সুখের কারণ॥
অবহিত হয়ে শোন কহিছেন আচার্য্যগণ।
সুখের আর দুঃখের ইহাই সুগম লক্ষণ॥"

সহবাসসম্মতিকমিটির রিপোর্ট—মোটের উপর আমরা আইনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারবিধানের পক্ষপাতী নহি। যে প্রথা অবলম্বনে লোকের জীবনহানির সম্ভাবনা, যথা সতীদাহ প্রভৃতি, সেই সকল প্রথা আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হোক। সহবাসসম্বন্ধীয় প্রথার যে অংশ স্ত্রীলোকের বা তাহার সন্তানের জীবনহানির বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে সমাজধ্বংসের সহায়তা করিতে পারে, সেই অংশ মাত্র আইনের সাহায্যে রহিত বা নিয়মিত করা হোক; অবশিষ্ট অংশকে স্বত-অভিব্যক্ত হইতে দিলেই ভাল হয়। তবে এই রিপোর্ট প্রাচীনপন্থীগণকে সহবাস প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান হইবার জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রথার উপর গ্রথিত—আমাদের দেশে উহা সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুসমাজ নামেমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সম্পূর্ণ নূতন সমাজরূপে গঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

নারীধর্ষণ—সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়দিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, তাঁহারা থিয়েটর বায়স্কোপ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া এই নারীধর্ষণের কি প্রকার সহায়তা করিতেছেন। নারীধর্ষণের জন্য শুধু হাহুতাশ বা অশ্রুবর্ষণ করিলে কি হইবে, যদি না তাহার প্রতিবিধানের যে সকল প্রকৃত উপায়, সেগুলি, আত্মসুখের পাছে ক্রটী ঘটে সেই ভয়ে অবলম্বন না করি? এই যে থিয়েটর প্রভৃতির সাহায্যে লোকের কামভাবকে উদ্দীপ্ত করা হইতেছে, এই যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক বাড়ী হইতে ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অশ্লীল ছবি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, ইহার পর নারীধর্ষণ যে নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? পয়সার লোভ ছাড়িয়া সমবেতভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐসকল কামোদ্দীপক ব্যবস্থাকে বয়কট করিবার উপায় অবলম্বন কর, তবে নারীধর্ষণ প্রতিরুদ্ধ করিবার আশা করিও।

—

গ্রন্থপরিচয়।

পূজোবাড়ি—(সামাজিক নক্‌সা)—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সুলভ প্রেস, পৃঃ ৩৯, মূল্য ।০

এই ক্ষুদ্র বইখানিতে যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ আছে তাহা যেমন সরল তেমনি স্বচ্ছ। নক্‌সাটি হয় ত একটু মোটা তুলিতে অঙ্কিত, ইহাতে হয় ত ততটা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও শিল্পানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে মানুষ, পূর্ব্বকালের পূর্ব্বানুশিষ্ট আচরণ মতে সরল নিষ্ঠা, ভক্তি বিশ্বাস ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ভুলিয়া দৈবানুগ্রহ বা দৈববল লাভে বঞ্চিত আছেন, তাহা এই চিত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাঁহাদের সাধনফল ও দৈববলে আস্থা আছে; তাঁহারা যেন এই পুস্তিকা যত্নের সহিত পাঠ করেন।

—

শোকসংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে গগনচন্দ্র হোম পরলোক গমন করেন। ময়মনসিংহ জেলায় ইঁহার জন্ম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ২২ বৎসর ধরিয়া "সঞ্জীবনী"র লেখক ছিলেন। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এবং উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মধ্যে বড়ই গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। গগনবাবুর অন্তরে একখানি নিরপেক্ষ ও উদারভাবের কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা জাগিল, যাহাতে ঐ গোঁড়ামী সকল সমাজ হইতে দূর হইতে পারে। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, তিনি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সবেমাত্র ছোটখাটো লেখকের পদে পদার্পণ করিয়াছি। আমিও তাঁহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিলাম। তিনি "আলোচনা" মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দেশ তখন নিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। কাজেই কাগজখানি নিরপেক্ষভাবে সুপরিচালিত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই উঠিয়া গেল! আমরা তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে আমাদের আন্তরিক গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহাদিগকে এই শোকভার বহনে সামর্থ্য প্রদান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়েআশ্রয় দিয়া শান্তি দান করুন।

সুভাষিত সংগ্রহ।

(ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা)

ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

গুরু আর মোরে রাখ দয়াময়,
শুভাশুভ যেন, পাই গো সমানে;
বীরের যে কাজ করি যেন দোঁহে
লভি যেন তেজ পঠন পাঠনে।
বিদ্বেষ যেন গো আমাদের মনে
নাহি পায় ঠাঁই মাগি ও চরণে॥

ওঁ যোদেবোহগ্নৌ যোহপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যোবনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোঃ নমঃ।

যে দেব আগুনে, জলে সমীরণে
পশেছে সবার পরাণে;
তরুলতা তৃণে, নিখিল ভুবনে
নমি নমি তাঁরি চরণে।

ময়ি সর্ব্বং ইদম্ প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।
গীতা।

হে ভারত, মণিমালার ভিতরে
সুতো নাহি চোখে পড়ে
নিখিল ভুবনে মরমে গোপনে
আছি আমি সবে ধরে।

উৎক্ষেপনং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিম্ কল্পিতং মাতুরধোক্ষ আগসে,
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশ ভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ।
ভাগবত দশমস্কন্ধে মুগ্ধব্রহ্মার স্তোত্র।

যবে শিশুর মূরতি উঠে গো বিকশি,
জননী জঠর মাঝে।
কর-পদাঘাত করে চারিভিতে
বিষম বেদনা বাজে॥
করুণার ছবি জননী তাহার,
ল'ন না ত অপরাধ।
মরমের ডোরে, বাঁধিয়া নিবিড়ে,
আনেন ভূতলে চাঁদ॥
আমাদেরো দোষ নিওনা হে হরি
মাগি এই তব ঠাঁই।
আছি যে নিয়ত তোমার জঠরে
তুমি ছাড়া কিছু নাই॥

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্যবোধিং বহুজন্ম দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতে।
ললিতবিস্তর।

এই আসনেতে শরীর আমার
যাক্ তবে শুকাইয়া।
ত্বক্ মাস্ হাড়, প্রলয়ে এবার
যাক্ তবে মিলাইয়া॥
না পাইলে বোধি, দুর্ল্লভ নিধি
বহুজনমের সার;
এ আসন হ'তে পরাণ থাকিতে
উঠিব না আমি আর॥

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

পূর্ণ রয়েছে ঐ মহালোক পূর্ণ মোদের ধরা,
পূর্ণ হইতে এসেছে পূর্ণ নিখিল সৃজন করা।
পূর্ণ হইতে পূর্ণই নিলে জেনে রাখো সাধু ভাই
হেঁয়ালির মতো পূর্ণই থাকে ইথে কোনো ভুল নাই॥

জ্বেলেছে যে জনা রবি আর শশী
বিছায়ে শ্যামল ধরা
নিতুই দেওয়ালি, যাঁর তারাবলি
সে নহে কাহারো গড়া।
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যাঽনির্ব্বচনিয়তা দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং যত্তীর্থযাত্রাদিনা—
ক্ষন্তব্যো জগদীশ তৎ বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী
ভাবিলাম যাহা মনে,
কথায় তোমারে কহনে না যায়
রচিলাম গাথা গানে।
নিখিল ভুবনে ছেয়ে আছ তুমি
বলে দিনু সবে তীরথের ভূমি
সাধিলাম পরমাদ।
ক্ষমিও দাসেরে, জগদীশ হরে,
(এই) বিকলতা-অপরাধ।

সঙ্গীত-স্বরলিপির মর্য্যাদা।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস)

সঙ্গীত-বিদ্যা অতি প্রাচীন, যখন বিজ্ঞান দর্শন ও গণিতশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে নাই, তখনও সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে এ দেশ মুখরিত হইত। ইহা সকল মানবের চিরন্তন ধন। কি রোম, কি গ্রীস্, কি ভারত, কি চীন যাহারই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করা যায়, দেখা যায়, সঙ্গীতের চর্চ্চা বহু পুর্ব্ব হইতে প্রচলিত। যখন কোনও বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ইহার বিলক্ষণ সাধনা ছিল। এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে সম্মোহিত করিয়াছে। সঙ্গীতের অপরাজিতা শক্তি, কবির কবিত্ব, তার্কিকের তর্ক ও বক্তার বাগ্মিতাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রই সঙ্গীতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকির সঙ্গীতশক্তি না থাকিলে, লব-কুশ কি করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদগণকে মোহিত করিয়াছিল। প্রতীচ্যের সেক্ষপিয়ার, মিল্টন, ও এডিসন প্রভৃতি রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হোমার দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার যখন পারশ্য দেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় টিমথিরস নামে একজন উচ্চ শ্রেণীর বীণাবাদক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, যখন তিনি বীররসের গান করিতেন, সেই সময়ে বীরপ্রবর আলেকজাণ্ডার সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। আবার যখন করুণ রসের আলাপ হইত, তখন সেই বীরশ্রেষ্ঠের মস্তক নত হইয়া পড়িত, তিনি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ইতিহাসে কথিত আছে, ইংলণ্ডের রাজা অ্যালফ্রেড শত্রু-শিবিরে গিয়া বীণার সঙ্গীতে শত্রুপক্ষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সমস্ত গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ ও তাহাদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, গ্রীক্ সঙ্গীতবিশারদ আরফিযস্ যখন বীণাযন্ত্রে গান করিতেন, তখন বনের জীবজন্তু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিত। এ দেশেও নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-বিশারদগণ সঙ্গীতের সাহায্যে বন্য পশুকেও মন্ত্রমুগ্ধ ও পাথর গলাইতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বনের কুরঙ্গকুল ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কাল ভুজঙ্গ বিবর ত্যাগ করিয়া অহিতুণ্ডিকের হস্তে অহিংস ভাবে ধরা দেয়। জলের জীব সঙ্গীতের আহ্বানে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া আনন্দে ছুটাছুটি করে, ইহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা বয়স্যগণ সহ যখন উদ্যানে গীতবাদ্যে রত থাকিতেন তখন দুইটি গণ্ডার তাঁহাদের গান শুনিতে আসিত, একদিন ঐ গণ্ডার দুইটি তাঁহাদের গানে এত আত্মহারা হইয়াছিল যে, নবাব তাহার একটিকে তীরের দ্বারা আঘাত করিলে সে সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ পশুদের সঙ্গীতানুরাগের বিষয় অনেক শুনা যায়। আর আমরা স্রষ্টার প্রধান জীব, সেই প্রাণমাতান সঙ্গীতশাস্ত্রকে অমর্য্যাদা করিয়া তাহাকে চির অন্ধকারময় রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত হইতেছি। মহাত্মা প্লেটো বলিয়াছেন, সঙ্গীত না জানিলে মানবের জ্ঞান সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। লুথার বলিয়াছেন, যে আচার্য্য ছাত্রদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহাকে তিনি যথার্থ আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্লুটার্ক বলেন, বিশ্বনিয়ন্তা এই জগৎকে ঠিক সঙ্গীতের প্রণালীতে সৃষ্ট করিয়াছেন। সঙ্গীত ঈশ্বর-উপাসনার প্রথম ও বিশেষ সহায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একাধারে আনন্দ, আমোদ, বিশ্রাম ও ভগবানে বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে সঙ্গীতকেই প্রথম সহায়রূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের সঙ্গীত অতি পুরাতন। দেবতা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং দেবতারাই প্রথম ইহা শিক্ষা করিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। আর সেই সময়ের লোক সঙ্গীত দেবতা-অধিকৃত মনে করিত। এমন কি সা-রে-গ-মাদি ৭টি স্বরকে সাতটি দেবতার অধিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করিত। ষড়জ-অগ্নি, ঋষভ-ব্রহ্মা, গান্ধার-সরস্বতী, মধ্যম-মহাদেব, পঞ্চম-লক্ষ্মী, ধৈবত-গণেশ, নিখাদ-সূর্য্য। হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর মহামায়ার মুখ হইতে একটি, এই ছয়টি রাগ প্রথম সৃষ্ট হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই ছয়টি রাগ প্রথম শিক্ষা করেন; আর ছয়টি রাগের সাধনার জন্য ছয়টি ঋতু নির্দ্দিষ্ট করিলেন যথা বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, শরৎকালে ভৈরব, হেমন্তে শ্রী এবং শিশিরে নটনারায়ণ; তৎপরে তিনি প্রত্যেক রাগের অনুগত করিয়া ছয়টি রাগিণী সৃষ্টি করেন, আর ঐ রাগিণীগুলি প্রত্যেক রাগের ভার্য্যা বলিয়া প্রচলিত করেন। নারদ, রম্ভা, তম্বুরু, হুহু আর ভরতকে তিনি এই সমস্ত রাগরাগিণী শিক্ষা দেন। মহর্ষি নারদ ও ভরত সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। উক্ত পঞ্চশিষ্যের ভিতর প্রায় সকলেই সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভরত-বিরচিত গ্রন্থের অস্তিত্ব অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে এবং উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর আরও ৪৮টী উপরাগের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের পুত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। ভদ্র নামক এক নট ঐ সমস্ত গ্রন্থের শিক্ষা দিতেন, ইহা নারদকৃত পঞ্চম সারসংহিতাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মহর্ষি ভরত ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রকার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে কেবল সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এমন নহে, কলা-কৌশলের যথাযোগ্য প্রয়োগপ্রণালীর প্রবর্ত্তয়িতা তিনিই। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থ এই মতের পরিপোষক।

(ক্রমশঃ)

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৩

১৮৫১ শক ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতের ঋষিরা ভগবানের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন। তাঁহারা বজ্র-নির্ঘোষে বলিয়াছেন যে, ঐ আকাশের সুবিস্তৃত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নিরাকার পরব্রহ্মকে ধরিয়া থাক, এই আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি কর, আর সঙ্গে সঙ্গে অভয় প্রাপ্ত হও। তাঁহারা বলিয়াছেন যে পিতামাতার নিকটে সন্তান যেমন নির্ভয়ে স্থিতি করে, তেমনি সেই অদৃশ্য ও সকলের স্রষ্টা, নিরাধার ও বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয় ও নিরাকার পরমাত্মাকে পিতামাতা জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহার সঙ্গে নির্ভয়ে স্থিতি কর এবং সম্পূর্ণ অভয় প্রাপ্ত হও। পর্ব্বত সকল যেমন ধ্রুব, এই পৃথিবী যেমন ধ্রুব, সেই মঙ্গল-স্বরূপ পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের তদপেক্ষা ধ্রুবতর আশ্রয়স্থান। তিনিই আমাদের একমাত্র পরম আশ্রয় তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। সেই পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভয়ভাবনা ভস্মীভূত করিয়া ফেল। সংসার তাঁহারই সৃষ্টি—অভয়ের সন্তান তুমি—তোমায় সংসার কিসের ভয় দেখাইবে? অন্ধকারেই ভয় হয়; যেখানে অজ্ঞান,যেখানে নিজের পদক্ষেপ দেখিতে পাই না, সেইখানেই ভয়। কিন্তু যখন সেই প্রাণারামকে আমাদের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করিব; যখন দেখিব যে, তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের উপর জল-জল করিয়া জ্বলিতেছে; যখন জানিব যে আমাদের জীবনের চতুর্দ্দিক তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত, তখন আমাদের ভয় কোথায়? তখন আমরা "অভয় তো হয়ে গেছি"। তোমরা প্রত্যেকে সেই মৃত্যুর অতীত অমৃত পুরুষের সন্তান, ইহা জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হও। সমস্ত বিভীষিকা পদদলিত কর। তোমাদের নিকটে মৃত্যু অমৃতে পরিণত হউক।

আমরা নির্ভীক হৃদয়ে আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া চলিব; ফল সেই ফলদাতার হস্তে রাখিব—ফলের বিষয় চিন্তাই করিব না। তাঁহার কার্য্য করিয়া চলিয়াছি, এই কথাটাই মন্ত্রের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। ফলের চিন্তা না থাকিলে ভয়েরও কোনও কারণ থাকিবে না। অতীতের ভুল ভ্রান্তির জন্য হা-হুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই। হা-হুতাশ করিবার, নিরাশা নিরানন্দের তপ্তনিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। একদিকে অতীতের ভুলভ্রান্তি, অপর দিকে ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল আশা, সমস্ত অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল। সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া, তোমার যোগক্ষেমের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, সেই অমৃত পুরুষের কার্য্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত করিয়া দাও। সমস্ত ভয়ভাবনা বিদূরিত হইবে। নিশ্চয় জানিও, যিনি সকল ভয়ের ভয়, তিনিই তোমার নিত্য

সঙ্গী। জীবনের প্রতি নিশ্বাসে তাঁহাকে জীবনের সঙ্গী জানিয়া নির্ভয় হও। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখাসুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতামাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া, অনুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের বর্ম্ম-দুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই প্রেমের নিশ্বাসে এই বিশ্বজগৎ নিশ্বসিত হইয়াছে এবং এই বসুন্ধরা জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারই জ্ঞানের একবিন্দু জ্ঞান-সিন্ধুতে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতের অণুপরমাণুতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোনও দেবতাকে সমস্ত হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া হৃদয়মনকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া নিজের অধোগতি ও বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার হস্তে তোমার জীবনতরীর হালটী নির্ভয়ে ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপা-ইয়া পড়—তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করি-বেন। বিপদের অন্ধকার তোমাকে শতবার আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও বিফল হইবে। তিনিই সমস্ত পুণ্যের, সমস্ত মঙ্গলের, সমস্ত কল্যাণের একমাত্র উৎস। সেই অখণ্ড উৎস হইতে এই সংসারের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও মঙ্গল শতধারে উৎসারিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আশ্চর্য্য-রূপে সিক্ত রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আসেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির উৎস বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা নির্ভীক হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের সঙ্গে অবলম্বন করুন এবং নির্ভীক হৃদয়ে নির্জ্জনে ও সজনে, অন্তরে ও বাহিরে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, সকল কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়া নিজের ও সন্তানগণের, দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধনে নিরত হউন। ঈশ্বরকে সকলের অগ্রে আসন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীব-নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ যাহাতে সাধিত হইতে পারে, সেই উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য বৃথা কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে বৃথা হাস্যে বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিয়া আত্ম-হত্যা করিবার সময় নাই। আমাদের সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত—আমাদের কার্য্য পর্ব্বতের সমান উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইও না। ভগবানের অভয়বাণী দিবানিশি আকাশ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে আকাশে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহাকে জীবনের—ইহজীবনের এব অনন্তকালের জীবনের নিত্য সঙ্গী, প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও—তাঁহারই কর্ম্ম জানিয়া প্রত্যেক শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারই প্রেরিত বীরের ধর্ম্ম জানিয়া অবলম্বন কর এবং একনিষ্ঠ ভাবে তাহা জীবনে সাধন কর। দেশের মুখ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হইবে; সন্তানসন্ততি নিশ্চয়ই উন্নতি ও মঙ্গল লাভ করিবে; দেশের দুঃখ দারিদ্র্য নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে। পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আজ প্রায় ৩৬ বৎসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিস্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া পূজ্যপাদ পিতামহদেব আমার স্কন্ধে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকীয় গুরুভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন। অনেক উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বড়ই আশা ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রহ্মোপাসকদিগের সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্মোপাসনাকে কেবল ভারতবাসীর নহে, সমগ্র জগৎবাসী সকল কার্য্যেরই নিয়ামকরূপে অচিরকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্ম-সমাজে সম্প্রীতির একান্তই অভাব। এবিষয়ে মহর্ষিদেবের সহিত আলাপ আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, রাজা রামমোহন রায় কোথায় বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য "বিগতবিবাদং" পরমে-শ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন, আর সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণে মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই!

ব্রাহ্মসমাজে মনোমালিন্যের প্রাবল্য দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি

* গত ৫ই ভাদ্র, আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

নাই। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবৎপ্রসাদে আমার সেই বিশ্বাস সেই আশা সফলতা লাভ করিতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব দেখিয়া যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়াছিলাম, আজকাল সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের মিলিতভাবে ব্রহ্মো-পাসনা করিবার ইচ্ছা দেখিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। ভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে. তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসক-গণের মধ্যে সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন যে আমরা বিগতবিবাদংএর উপাসক হইয়া সত্যসত্যই বিগতবিবাদ হই।

যে দিন পিতামাতার চরণে সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পূজা সর্ব্বপ্রথম নিবেদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পরস্পরকে পরস্পরের বক্ষে টানিয়া লইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সম্মুখের সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

এই ৬ই ভাদ্রের পবিত্রভাব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি কি না সন্দেহ। যাঁহারা এই দিনের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া-ছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার বীজ এদেশে রোপিত হইয়া-ছিল, তাহা আলোচনা করিলে নির্ব্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে। আজ শতাব্দী হইতে চলিল, এই পুণ্যাহে এই দুর্ব্বল ভারতের দুর্ব্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া জগতের ভাবসাগরে এমন একটী তরঙ্গ চালাইয়া দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগৎকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন বাঙ্গালীর দ্বারা সেই তরঙ্গ প্রথমে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে গৌরব অনুভব করিতেছি।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন দুঃসাধ্য। কিন্তু পবিত্র ৬উ ভাদ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উপ্ত হইবার ফলেই ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের উপায়স্বরূপে ধর্ম্ম-মহাসভের কল্পনা নিঃসৃত হইয়াছিল। যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নব্যযুগে বঙ্গ-দেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার মূল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীনতার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া না ফেলিতেন, তবে ভারতবর্ষীয়ের উচ্চতর রাজ-পদে প্রবেশ লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথকে অথবা বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত আশার প্রথম দীপ্ত দীপধারক সুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না জানি না; জড় ও জীবের সামঞ্জস্যপ্রকাশক জগদীশ-চন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যার অন্যতর অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের যে কোন সত্যসুন্দরমঙ্গল ভাব জগতের গাত্রে স্বীয় মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সক-লেরই মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজরূপে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, সেই শুভদিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন—জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ।

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় পুণ্যাহেরও কার্য্য আরম্ভ হয় ভগবানের পূজার দ্বারা। যিনি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে, দুর্ব্বল-সবল-নির্ব্বিশেষে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যিনি সকলের পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাঁহারই পবিত্র নাম যখন বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্রপাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহকেও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া সেই ভগ-বানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর ভক্তিকুসুম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় আছে কি না সন্দেহ। প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীদিগের মনের স্বাভাবিক গতিই ধর্ম্মের দিকে, তাই উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ব্বাহে প্রত্যেক শুভদিনে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের পূজা করিয়া তবে অন্যান্য শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, সত্য-ধর্ম্মের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, আমাদের সকল ধর্ম্মকেই, আমাদের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্ম্মকেই ভগবৎ-

কেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা স্থির জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে পরিণামে বিনাশের পথে নামিতে হয়। অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারতবাসী এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগত বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ম্ম সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে পরিণামে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বিগত মহাসমরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাসমরের কঠোর আঘাতেও পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূল ভাবসকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের পথিক করিয়া দিবেন।

আমাদের দেশে পুণ্যাহের সূত্রে দুইটী প্রধান কার্য্য সংসাধিত হয়—রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবর্দ্ধন। রাজাপ্রজার এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ অবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজেরও পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের দেবতা যিনি, তিনিই যে ব্রাহ্মসমাজেরও রাজা। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। আমরা যাঁহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পূজার্ঘ্য প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নানাবিধ স্বরূপের বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময়েই তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বিগতবিবাদ স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করি বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি? আমরা কয়বার তাঁহার এই স্বরূপের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই অথবা উপদেশ দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যদি বিশেষ মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সম্ভাবনা আসিতেই পারিত না। উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন। কথাটীর মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত একযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিষয়ক স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মের বিগতবিবাদ-স্বরূপে তন্ময় হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হইব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামমোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটীর বিষয় অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তিরোভাবের পর তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের উপর তাঁহার এতই বিদ্বেষ ছিল যে, একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ভিত্তিই এই করিলেন যে, সেথানে এমনভাবে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, যাহাতে বিবাদের পরিবর্ত্তে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। আমরা যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে এবং তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে।

আমরা প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাঁহার সন্তানগণ বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর সুখী ও আনন্দিত হয়েন। প্রত্যেক মাতা যাঁহার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে তিনিও কি আনন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসম্বাদ আসিবারই বা কারণ কি? বিগতবিবাদঃ পরমেশ্বর যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়া বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিতে দেখি যে দুইটী অণুপরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ তাহারা কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে পারে

না—প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য্য অবিচলিত নিয়মে করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতি হইতেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে আমরা কেহই কাহারও সহিত একেবারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না—পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? স্বামীর সহিত কি স্ত্রীই একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে? ভগবানের সৃষ্টিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে, জীবজন্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো তাঁহার সৃষ্টিই থাকিতে পারিত না। তাঁহার সৃষ্টিও থাকিবে এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি।

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু আমাদের সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। বিগতবিবাদংএর পূজাতে বিবাদ আসিবে কেন? শ্রীক্ষেত্রে দেখি, সেখানে শতসহস্র যাত্রী বিশ্বাসের বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে; আর আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক—আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রহ্মের উপাসক—আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না? এখন চারিদিকেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সকলেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া রাখিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে পারে, অভিমানশূন্য হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মাতৃমন্দিরে আসিবার সময় আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার নির্ব্বিবাদ ভাবে যখন সেই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ত্রিশকোটি সন্তান একহৃদয়ে একই মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে কি যে অপূর্ব্ব বিরাট সাড়া পড়িবে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের ভিতর হইতে হিংসা দ্বন্দ্ব চলিয়া যাক, নির্ম্মূল হইয়া যাক। হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, দেখিবে প্রাণটা কতদূর সবল হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্ তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমাদের হৃদয় হইতে হিংসাদ্বেষ, বিবাদকলহ বজ্রের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে বিগতবিবাদ পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকেই জীবনের কর্ণধার করিয়া শত বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা তোমার আদেশ সুখে বহন করি এবং তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। তোমাকে আমাদের একই পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল বাসিতে শিক্ষা করি। হে হৃদয়ের দেবতা আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর।

শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন*

(শ্রীবাণীদেবী)

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক—তাহাদের শিক্ষার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুমিষ্ট সুর শুনিলে শিশুদিগের মন স্বভাবতই সেই দিকে ছুটিয়া যায়। ইহা সকলেরই বোধ হয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, মায়েরা সুমধুর সুরে গান গাহিলে শিশুরা কেমন সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বে-সুরা গান করিলে তাহাদের কাণ ও প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে না দেখা গিয়াছে। ভাল হাল্কা ছেলে-ভুলোনো গানের সঙ্গে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত দুঃখ দূর হয় এবং আনন্দের হাসি তাহার সমস্ত প্রাণটুকু দখল করিয়া বসে।

ছেলেরা যে সমস্ত গান শোনে সে সমস্তের ভিতর যে-গুলো তাহাদের প্রাণে ভাল লাগে, সেগুলো তাহারা অনেকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কেমন সহজে ধরিয়া লয়। অনেক ছেলে গলার সুরের অভাবে বাহিরে গান-গুলি গাহিতে না পারিলেও মনের ভিতরে গাহিতে ছাড়ে না। যাঁহাদের গৃহে ছোট ছেলে মেয়ে আছে, স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিতে থাকিলেই তাঁহাদের ইহা নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইবে। সমস্ত গানটা যদি তাহারা গাহিতে নাও পারে,

* বঙ্গীয় মহিলাশিক্ষাসঙ্ঘের অধীনে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে গত ১৭ই আগষ্ট ১২৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট Y. W. C. Aর মণ্ডপে পঠিত।

তবু সেই গানের কতকগুলি সুমিষ্ট সুর এক সঙ্গে করিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবে না। আর যদি তাহারা কোন একটী গান শিখিতে পারে, তবে তাহাদের আনন্দ দেখে কে? তাহারা সেই গান ক্রমান্বয়ে আওড়াইতে আওড়াইতে গাহিতে গাহিতে একপ্রকার মুখস্থ করিয়া ফেলে।

গানের ভিতর দিয়াই শিশুরা অনেক সময়েই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসুক হয়। এই প্রকারে ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই শিশুরা বড়ই আনন্দ পায় এবং অতিশয় আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শিশুরা কোন একটী হাল্কা সুরের গান কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতে শুনিতে কিপ্রকার একপ্রাণে আহ্লাদের সঙ্গে সেই গান গাহিয়া প্রাণটাকেও হাল্কা করিতে চায়, তিনিই বুঝিবেন যে, শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া উচিত কেন? তাহা ছাড়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুরা পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে গান করিতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যেন বাঁচিয়া যায়—তাহাদের সে সময়ের আগ্রহ দেখে কে! আমার বেশ মনে পড়ে,—Loreto Conventএ আমি যখন পড়িতাম, অনেকক্ষণ একটানা পড়ার পর যখন শিক্ষয়িত্রী Nunরা আমাদিগকে গানের শ্রেণীতে লইয়া যাইতেন, তখন আমাদের তাহা কিরকম ভাল লাগিত। গান শিক্ষার ফলে আমরা যেন নূতন প্রাণ পাইতাম। গানের শ্রেণী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িতে বসিতাম। এইরূপ দিনে দুই তিন বার শিক্ষয়িত্রীগণ গানের দ্বারা পড়ার শুষ্কতা কমাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীতে এইভাবে গান শিক্ষা দেওয়া আমাদের নজরে পড়ে নাই—শুনিতে পাই, এখন কতকটা এ বিষয়ের চেষ্টা চলিতেছে।

শিশুদের অন্তরে গানের প্রতি একটা রুচি জন্মাইয়া দিবার শৈশবই সুপ্রশস্ত সময়। এই সময় তাহাদের মন প্রাণ যাহা সম্মুখে দেখিবে তাহাই যেন গিলিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, সুতরাং গানে রুচি জন্মাইবার এমন অবসর হেলায় হারানো কিছুতেই উচিত নয়। এমন সময় হেলায় হারাইলে পরে তাহাদের বয়স যতই বেশী হইবে, ততই ঐ রুচি অন্তরে প্রবেশ করানো কঠিন হইবে। আজকাল যখন গান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষার অন্যতর বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে, তখন শৈশব অবধি গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত করিয়া বালকদিগের গানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথ সুগম করিলে ভাল হয়।

আর একটী বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। গানের সাহায্যে শিশুদিগের এবং বালকবালিকাদের মন ভগবানের দিকে যেমন সহজে লইয়া যাওয়া চলে, এমন আর কিছুতে নয়। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে, শিশুদিগকে গান শিক্ষা দিবার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য করা উচিত, যাহাতে তাহাদের মতিগতি সহজেই ভগবানের দিকে যায়। শিশুরা যখন উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিবে তখন তাহাদেরও উচিত, সকল গানের উৎস ভগবানেরই চরণপূজায় তাহাদের ক্ষমতা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করা।

শৈশবে শিশুদিগকে কানের ভিতর দিয়া গান শেখানো উচিত; পড়ার মত বইয়ের ভিতর দিয়া শেখানো সঙ্গত নহে। এই তত্ত্ব আজকাল হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি শিক্ষাতাত্ত্বিকদিগের কল্যাণে অনেকেরই নিকটে সহজ সত্য বলিয়া মনে হইলেও, আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে আমার পিতামহদেব স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহা কিরূপে হৃদ্গত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্য হই। আমরা বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে, পিতামহদেব তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অতি শৈশবকালেই, বৎসর দুই তিন বয়স অবধিই, তিনি যেখানে গান শিক্ষা করিতেন, সেইখানেই শোয়াইয়া রাখিতেন এবং বলিতেন যে, উহাদের কান ঠিক করিবার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিতেছেন। ৺প্রতিভা দেবী প্রভৃতির সঙ্গীতে পারদর্শিতায় আমরা তাঁহার এই কার্য্যের সাফল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সঙ্গীতে যাঁহারা পারদর্শিতা লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ হইবার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে নানাবিধ সঙ্গীত-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদিগের নিকট শুনিয়া দেখিয়া গান প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, স্বরলিপি প্রভৃতিরও সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু শৈশবেই শিশুদিগের মাথায় এগুলি হাতুড়ি পিটিয়া বসাইবার চেষ্টা করা কিছুতেই ঠিক নহে। প্রথম অবধি সঙ্গীত-কৌশল প্রভৃতি শিশুর মস্তকে ঢুকাইতে গেলে তাহার মাথার ভিতর সমস্ত গোলমালে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে গানের বিরুদ্ধে শিশুর বিদ্রোহী হইয়া ওঠার সম্ভাবনা আছে। ইহার বিপরীতে যদি ভাল ভাল সুরের হালকা গান শুনাইয়া শিশুর প্রাণে গানের প্রতি একটা ভালবাসা জাগাইয়া তোলা যায়, তবে সে যথাসময়ে সঙ্গীত-কৌশল শিখিবার জন্য আপনিই ঝুঁকিয়া পড়িবে। সেই ভালবাসা জাগাইবার জন্য প্রথম-প্রথম শিক্ষকের মুখে অর্থাৎ গুরুমুখে শুনিয়া এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া হালকা লয় ও সুরের গান শিক্ষা করাই শিশুর পক্ষে বিধিসঙ্গত।

এখন একটু ভাবিয়া দেখা যাক যে, শিশুদিগের জন্য কি ধরণের গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা বলিয়াছি বটে যে, ঈশ্বরের উপাসনাই শিশুদিগের গান শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং ঐ প্রকার উপাসনাতে গানের সদ্ব্যবহার করিলে গানশিক্ষা সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, শিশুরা কেবল ধর্ম্মসঙ্গীতই শিক্ষা ও অভ্যাস করিবে, কোন প্রকার আনন্দের বা হাসির গান শিক্ষা করিবে না। এরূপ করিলে তাহাদের মনে আনন্দের উৎস বিকশিত হইবার পরিবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শিশুদের, বালকবালিকাদের, বয়সের ধর্ম্মই হইল দুঃখবিষাদের পরিবর্ত্তে, গুরু-গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে হর্ষে আনন্দে হাসি-খুসিতে বেশী রকম গা ভাসাইয়া দেওয়া। সেই আনন্দ, :সেই হর্ষ, সেই হাসি-খুসি যে সমস্ত গানে শিশুদিগের মনে ফুটিতে পায় এবং তাহাদের সরল প্রাণে নানা আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে, সেই সমস্ত গানও নিশ্চয়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই সমস্ত গান হালকা তালের ও ছন্দের, হালকা সুরের এবং হালকা ভাষা ও ভাবের হওয়া উচিত। গুরুগম্ভীর ছন্দের গান তাহাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব মনে হয় না; দুঃখের গানও তাহাদের মনের সঙ্গে খাপ খাইবে না।

তাই বলিয়া নিধুবাবুর টপ্পাজাতীয় গান শিশুদের পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না, প্রত্যুত সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জনীয়। এইপ্রকার গান দেহমনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করে, যাঁহারা ঐ সকল গানের তত্ত্ব রাখেন, তাঁহারাই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শৈশবে শিশুদের অন্তরে যে বীজ রোপিত হইবে, তাহাই উত্তর-কালে বর্দ্ধিত হইয়া সেই বীজেরই উপযুক্ত ফল প্রদান করিবে। কুরুচিসম্পন্ন অনিষ্টকর গান শিক্ষা দিলে শিশু যৌবনে পদার্পণ করিয়া যখন বুঝিবে যে তাহার অভিভাবকেরা ও তাহার গানশিক্ষাদাতা তাহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; যখন সে বুঝিবে যে, সে ঐ প্রকার গানশিক্ষার ফলে চেষ্টা করিয়াও দুর্নীতিপরতার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তখন সে তাহার অভিভাবক বা শিক্ষককে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না। শিশুগণ যখন ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তখন উহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যে কিরূপ দায়ীত্বপূর্ণ তাহা আমাদের প্রতি পদে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা তাই বলি যে, শিশুসঙ্গীতে ভাল ভাব, ভাল সুর, ভাল কথা যাহাতে থাকে, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং সঙ্গীত করিয়া অপর পাঁচজনকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মানবহৃদয় লালায়িত। পশু-পক্ষীরাও যখন সঙ্গীত শুনাইতে ও শুনিতে ভালবাসে, তখন মানবাত্মাও যে তাহাতে সুখী হইবে, তাহ আর আশ্চর্য্য কি?" এই ইচ্ছাকে উন্মেষ অবধি সুপথে চালিত না করিলে শিশুরা কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করিলে ঐ ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধনের জন্য কুসংসর্গে আপনাকে আহুতি প্রদান করে। সুতরাং শিশুবিদ্যালয়েই গান নির্বাসিত করিবার পরিবর্ত্তে ভাল গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই প্রার্থনীয়, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়।* এই কারণে শিশুদের মনে যাহাতে প্রফুল্ল অথচ ভাল ভাবই জাগিয়া উঠে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি কতকগুলি গান নির্ব্বাচন করিয়াছি, যেমন, "আজি প্রাণ আকুলিয়ে" "এলো বসন্ত আজিকে" ইত্যাদি। শিশুদের জন্য বিলম্বলয়ের গান কেন যে অনুপযোগী, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখবিষাদপূর্ণ বা অন্যান্য গুরুগম্ভীর গানের ভাবই যেন উহাকে বিলম্ব-লয়ের দিকে স্বভাবতই লইয়া যাইতে চায়। ওস্তাদী গানের সুর ও লয়ের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এবং নিজের বিশেষত্ব রাখিয়াও বাঙ্গলা গান কিরূপে শিশুদের উপযোগী করা যাইতে পারে, পিতৃদেবের "আজি প্রাণ আকুলিয়ে" "বাঁশরী বাজায় কে" প্রভৃতি গানে তাহা সুন্দর প্রকাশ পাই-তেছে।

শিশুদিগকে প্রথম অবধিই বেশী উচু সুরে গান শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় ইংরাজীতে মধ্য স্বরগ্রামের যাহাকে C সুর বলে, সেই সুরেই আরম্ভ করানো উচিত। আমাদের তানপুরার সুর ঐ ভাবেই বাঁধা থাকে। আমি দেখিয়াছি তানপুরার সঙ্গে স্বর-সাধনা অর্থাৎ সা-রে-গা-মা সুরের চর্চ্চা করিলে গলা বেশ সহজে আয়ত্ত হয়। হারমোনিয়ম প্রভৃতির সঙ্গে স্বর-সাধনা করিলে সাময়িক খুব চটক দিতে পারা যায়—তাহার প্রতি note বা সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহি-লেই চলে। কিন্তু তানপুরার সঙ্গে গাওয়া অভ্যাস করিলে গান অনেকটা সহজে আয়ত্ত হয় বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বিনা যন্ত্রের সাহায্যে, এমন কি তানপুরারও সাহায্য না লইয়া গান গাওয়া সহজে আয়ত্ত হইতে পারে। অনেক কাল ধরিয়া ঐ মধ্য সপ্তকের ভিতরেই শিশুর স্বরসাধনা আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা বেশী উচু

* পিতৃদেব আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ২২৬-২২৮পৃঃ দেখ। (২য় সংস্করণ)।

সুরে অভ্যাস করাইতে থাকিলে গলা খারাপ হইয়া যায়। এক সুর হইতে যে অপর সুরে যাইতে হইবে, সে সুরটী কাছাকাছি সুর হওয়া উচিত—দূরবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। সা হইতে রে বা গা বা মা-তে যায় এই রকম গান দেওয়া উচিত। কিন্তু নীচু সা হইতে একেবারে সহসা উচু গা বা ধা বা নি লাগে, এমন গান শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। বেশী গিটকিরি বা গমক প্রভৃতি আছে এমন গানও শিশুদের উপযোগী নয়। চৌতাল মধ্যমান প্রভৃতি তালের গান শিশুদের অনুপযোগী। শিশুদের গানের তাল একতালা, কাওয়ালি, ঝাঁপতাল প্রভৃতি যে সমস্ত তাল কানে সহজে ধরা যায়, সেই রকম তাল হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে অনেক তাল theoretically খুবই কঠিন হইলেও কার্য্যত সহজে আয়ত্ত করা যায়।

একই গান দুই তিন জন মিলিয়া দুই তিন অংশে গান করাও আমার মনে হয়, প্রথম অবস্থায় শিশুদের উপযোগী নহে। প্রথম অবস্থায় সমস্ত গানটী বেশী ভাগ একসঙ্গে মিলিতভাবে অভ্যাস করাইয়া পরে পৃথকভাবে অভ্যাস করাইলেই শিশুদের পক্ষে গানটী "আদায়" বা আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, শিশুদের গান নির্ব্বাচনে কেবল সুর বা তালের দিকে দেখিলে চলিবে না, তাহার কথা এবং তাহার অর্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কথাগুলি যদি কেবলই উপদেশপূর্ণ অথবা তত্ত্বরাশিতে পূর্ণ থাকে, তাহা শিশুদের মোটেই ভাল লাগিবে না। এই কারণে দেখা যায় যে, শিশুরা গণিত বা ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত শ্লোকগুলি সহজে বরদাস্ত করিতে চাহে না। গানের কথাগুলি সহজবোধ্য হওয়া উচিত এবং তাহার ভাব এমন হওয়া উচিত, যাহাতে শিশুরা আনন্দ পায়, যাহাতে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রাণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে।

শিশুদিগকে ভাল গানই শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভাল গান শিক্ষার একটা ফল মনেতে সুরুচি আনা। শিশুদিগকে প্রথম অবধিই সভ্যভব্য ভাবেও গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সকল শিশু সকল সময়ে যে সুরুচিসম্মত সভ্যভব্য প্রণালীতে গাহিতে থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু যে শিশু ঠিক সুরে গাহিতে পারিবে না, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন সে অন্যদের গানের মাঝখানে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া না ওঠে; যদি অন্যদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে সে গাহিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে নীরব থাকা, মুখ বুজিয়া থাকা শতগুণে ভাল। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, অন্যেরা সুস্বরে গান গাহিয়া যে আনন্দ পাইতেছে সে আনন্দে ব্যাঘাত দিবার তাহার অধিকার নাই।

উপসংহারে, আমি পুনরুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, শিশুদের মন হইতে পড়ার বা কাজের বোঝা হালকা করিবার পক্ষে গানের মত সহায় দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে। সকলেই তো দেখিয়াছেন যে, কোন একটা ভারী বোঝা বহিতে গেলে কুলিরা কষ্টলাঘবের জন্য গানের সুরে নানা কথা আওড়াইতে থাকে। কাজের শেষে গান করিতে থাকিলে শ্রান্তি ও ক্লান্তি সহজেই দূর হয়, এবং কাজের আরম্ভে গান করিতে থাকিলে কাজ করিবার একটা জোর পাওয়া যায়। মনের উপর গান হাওয়া খেলার কাজ করে; শিশুদের প্রাণে যে সমস্ত ভাবরাশি চাপা থাকিয়া তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকে, সেগুলি গানের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায়, এবং তাহার ফলে শিশুরা শান্তি পায়। গ্রীষ্মকালের বদ্ধ উষ্মা যেমন বর্ষার বারিধারা লাভ করিয়া বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় একটা নবোৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, সেইরূপ শিশুদেরও প্রাণে যখন গানের অমৃতধারা নামিয়া আসে, তখন তাহাদের প্রাণের উষ্মা বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় তাহাদের প্রাণে নবভাব জাগিয়া উঠিয়া একটা ঝরঝরে ভাব আনিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে যথোচিত শাসনে ও নিয়মে অর্থাৎ disciplineএর অধীনে রাখিবার গান এক অব্যর্থ উপায়। শিশুবিদ্যালয় বেশ ভালভাবে চালাইতে গেলে আমার মনে হয় সঙ্গীতবিদ্যাকে শিশুদের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ করা উচিত। তাহাদের প্রথম বয়সে পড়াশুনার পরিবর্ত্তে আমার মতে সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বাহিরের যে সকল বিষয়ে তাহাদের প্রাণে সাড়া দেয়, সেই সকল বিষয়েই বেশী ঝোঁক দেওয়া উচিত এবং সেই সকল বিষয় যাহাতে শিশুবিদ্যালয়ে ক্ষণে ক্ষণে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে খুব বেশী লক্ষ্য ও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে ভালরকমে সুভাব সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে শিশুবিদ্যালয়ের প্রাণ সজীব থাকিবে এবং শিশুরা দেহে মনে ও আত্মাতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উত্তরকালে যথাসময়ে জগতের মঙ্গলসাধনে ও কল্যাণবিধানে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই সকল কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী কতকগুলি গান গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিলে শিশুদিগের শিখিবার এবং শিক্ষয়িত্রীর ও শিক্ষকদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হয় ও জনসাধারণের উপকার হয়।

——

ব্রাহ্মধর্ম্মের দান।*

ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া এই ভাদ্রোৎসব যে শুভদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই শুভ ৬ই ভাদ্র দিবসে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ সর্ব্বপ্রথম এদেশে রোপিত হয়। এই কারণে ৬ই ভাদ্র আমাদের প্রিয় এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবও আমাদের প্রিয়। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৭৫১ শকের শুভ ১১ই মাঘে উত্তোলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের পুণ্য তীর্থভূমি আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শতাব্দী পূর্ণ হইতে তো আর কয়েক মাস মাত্র বাকী। আজ শতাব্দী পরে আমাদের দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কি পাইয়াছি; দেশকে জাতিকে এবং জগতের অধিবাসীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি দিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসী এবং জনসাধারণকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দান হইতেছে সত্যধর্ম্মের এই কল্যাণপ্রদ বীজমন্ত্র—"বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ ও অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়"। এই বীজমন্ত্রেরই উপরে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান। মানবের যাহা কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যত কিছু শুভ অনুষ্ঠান হয় বা হওয়া সম্ভব, এই বীজমন্ত্রে সে সমস্তেরই সমাবেশ হইতে পারে।

ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি সন্নিবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলাই বাহুল্য।

উপাসনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হইল ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করা। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতিভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেও প্রবৃত্তি স্বতই আসিবে। ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন, উপাসনার এই দুইটী অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই দুই আকার। উভয়ে এত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে, একটীর অভাবে অপরটী শুষ্ক ও ম্লান হইয়া মৃত্যুমুখে ঝরিয়া পড়ে।

ভগবানের পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহেরও প্রয়োজন নাই, রাশি রাশি যাগযজ্ঞের আয়োজন, বা রাশি রাশি জীবজন্তুর বলিদানেরও ব্যবহার প্রয়োজন নাই, অথবা প্রতিমা গঠনেরও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মোপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইল তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। তাঁহাকে করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী জননী বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। সরল প্রাণে সরল পথে জননীর নিকট সন্তানের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে চলিতে হইবে। বাহিরের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্তরের বিষয় ভালরূপ জানিতে পারি না, দেখিতে পাই না। আমাদের মন চারিদিকে এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে এতই ছুটাছুটি করে; বাহিরের কোলাহল কলরবের সঙ্গে এতই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে পরম স্নেহময়ী জননী তাঁহার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার মধুময় ইঙ্গিতে শত দুঃখশোক, সহস্র বিপদআপদের মধ্যেও শান্তি আসিয়া আমাদের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করে।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে আমরা চিরকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া আনন্দও লাভ করি না, সুখশান্তিও খুঁজিয়া পাই না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা আসিয়া পড়ে, যাহা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদের দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য করে। আমরা যখন দুঃখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ আপদের মর্ম্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি, এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া দুই মুহূর্ত্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য অগ্রসর হয় না। তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জননীর শান্তস্বরূপ ও মধুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক স্বতই অবনত হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতের কার্য্যসকল আলোচনা কর, যুক্তি তোমাকে শূন্যের কোটায় লইয়া যাইবে; তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল বিষয় আলোচনা কর, সকলই তোমাকে পূর্ণের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

* ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৯ই ভাদ্র ১০০ ব্রাহ্ম সম্বতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

তিনি বহিরাকাশেও আছেন; আবার তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটে আত্মার নিভৃততম প্রদেশেও আছেন। এই বিশ্বজগতের যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা, এবং তাহার যে বিরাটবিশাল অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা দৃষ্টির অতীত তাহা, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলরাজ্য। সমস্ত বিশ্বজগতে, বিশ্বজগতের প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি প্রসারিত। তাঁহার আসন সর্ব্বত্র। কোটী কোটী রবিশশী গ্রহতারকামণ্ডিত দ্যুলোকে যাও, সেখানেও তিনি; লক্ষ কোটী ওষধিবনস্পতিশোভিত, লক্ষবিধ জীবজন্তুসমন্বিত এই ভূলোকই দেখ, সেখানেও তিনি। গগনস্পর্শী মেঘচুম্বী হিমালয়ের উন্নততম শিখরে উঠিয়া যাও, সেখানেও তিনি; অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে নামিয়া যাও, সেখানেও তিনি। কনকতপনের উদীয়মান অরুণমহিমার মধ্যেও তিনি; সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তিনি।

তুমি শুভ চিন্তা কর, তাহাও যেমন তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়, সেইরূপ তুমি পাপচিন্তা কর, পাপ আচরণ কর, তাহাও তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়। পাপ করিয়া তাঁহা হইতে লুকাইবার চেষ্টা বৃথা। তিনি জননী। তাঁহার নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের পাপতাপ সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও, এবং পাপ চিন্তা এবং পাপ আচরণ অতিক্রম করিবার বল ভিক্ষা কর।

তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদের পুরোহিত। তিনি আমাদিগকে নিমেষে নিমেষে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। ভুলভ্রান্তিও যদি কিছু আমরা করি, নিশ্চয়ই জানিও যে, সে সমস্তও সেই অভয়দাতা পরম পুরুষ এক অপূর্ব্ব মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন। অন্তরের দ্বন্দ্ববিবাদ দ্বেষহিংসা সমস্তই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরম পুরুষের মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি কর এবং শান্তিসমুদ্রে অবগাহন কর।

তিনি অনাদি। সমস্ত ব্রহ্মচক্রের আদিতে গিয়া দাঁড়াইলেও কেহ পরব্রহ্মের আদি বলিতে পারিবে না। যখন এই বিশ্বজগত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারও যখন ছিল না; মৃত্যুর উত্তপ্ত নিশ্বাসে যখন এই বিশ্বচক্র দগ্ধ হইতেছিল, মৃত্যুও যখন ছিল না, তখন একমাত্র তিনিই স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন। ধ্রুব পর্ব্বতসকল যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখনও তিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে পর্ব্বতসকল শক্তিলাভ করিয়া সমুন্নত মস্তকে গগন ভেদ করিতে সমুদ্যত; তাঁহারই আদেশে পর্ব্বতসকল স্বীয় জীবনের বিনিময়েও শত শত নির্ঝরিণীর সাহায্যে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটী কোটী প্রাণীর জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। সকলের আধার এই পৃথিবী যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে কোটী কোটী ফুল্লকুসুমের বিচিত্র শোভাগন্ধে এই পৃথিবী নিত্য প্রফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে এবং কোটী কোটী জীবজন্তুর আনন্দধ্বনিতে নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিতেছে; এই পৃথিবীর শতবিধ ওষধি বনস্পতির ভিতর দিয়া একমাত্র তাঁহারই অনুপম প্রেম নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কোটি সূর্য্য কোটী চন্দ্র, কোটী গ্রহতারকসমন্বিত এই ব্রহ্মচক্র যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া এই অগণিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র এই সুবিশাল গগনমণ্ডলকে একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাতে বিচিত্র বসনে বিভূষিত করিল; তাঁহারই প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া এই ব্রহ্মচক্রে প্রাণের উৎস উৎসারিত হইল; তাঁহারই আদেশে এই ব্রহ্মচক্রে জ্ঞান ও প্রেমের অফুরন্ত উৎসসকল খুলিয়া গিয়া প্রাণীসমূহকে দিবানিশি দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। তিনি যে শক্তি এই আকাশে বিকশিত করিলেন; তিনি যে প্রাণ, সে জীবনীশক্তি প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন, সেই শক্তি ও প্রাণ অবলম্বনে আশ্চর্য্য প্রণালীতে এই আকাশ শতখণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়া লক্ষকোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের জন্মদান করিল। সেই সকল সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য প্রণালীবশে শতসহস্র লক্ষকোটী জীবজন্তুর জন্মদান করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

তিনি অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, তাঁহার অন্তও নাই। তাই কবির সঙ্গে একহৃদয়ে প্রত্যেক মানবেরই হৃদয় হইতে এই প্রশ্ন স্বতই সমুদিত হয়—অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর? বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত প্রকাশিত হইয়া মহাশূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গল আদেশে আশ্চর্য্য সুনিশ্চল নিয়মে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—কে জানে কোথায়? এই অনন্ত স্থান ও অনন্ত কাল তাঁহারই অনন্তভাবের ছায়ামাত্র।

তিনি অনাদ্যনন্ত বলিয়াই অদ্বিতীয় ও অপ্রতিম। তাঁহার তুলনা নাই। কোনও সৃষ্টপদার্থকেই তাঁহার প্রতিমা ধরা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যকেও তাঁহার পূর্ণাবতার বলা যাইতে পারে না। তাঁহার প্রতিমা কে জানে যে, সে তাহা সংগঠন করিবে? নিজে

পূর্ণ পুরুষ না হইলে কে সেই পূর্ণ পুরুষকে ধারণা করিবে? কল্পনাবলে তাঁহার প্রতিমা গড়িতে যাওয়া বা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা বৃথা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করার অধিক কিছুই নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত। তিনি সীমার অতীত বলিয়াই নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। সুতরাং তিনি কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর না কেন, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

তিনি অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যে চন্দ্রে, পুষ্পে পত্রে, ভূধরে সাগরে, গ্রহতারার নীরব গানে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভজনিত অপার শান্তিতে, সকলের মধ্যেই তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার সুন্দর প্রকাশ যেমন বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার সুন্দরতর প্রকাশ: সেইরূপ মানবাত্মার অন্তরে। অরুণতপন যখন শতবিধ বর্ণে পূর্ব্বগগন রাঙ্গাইয়া উদয়াচলে আরোহণ করে; পূর্ণিমা নিশীথে যখন চন্দ্রমা ধরাপৃষ্ঠকে জ্যোৎস্নাধবলিত করে, তখন তাহার ভিতর সাধক সূর্য্যের অন্তরাত্মা, চন্দ্রের অন্তরাত্মা ভগবানেরই আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখেন। বর্ষাগমে যখন পূর্ব্বগগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি দেখা দিয়া কৃষকগণের হৃদয়কে আনন্দিত করে, তখন অগ্নিতে জলেতে ও বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট পরম দেবতা একমাত্র ভগবানেরই মঙ্গলমূর্ত্তি তাহার মধ্য হইতে সাধকের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠে। আবার যখন মানুষ শুভ কামনা করিয়া তাহাকে সফল করিবার জন্য প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিয়া সাড়া পায়, তখন তো সে অন্তরে তাঁহারই মঙ্গলমূর্ত্তি জাগ্রত দেখে। মানুষ পাপতাপে দগ্ধ হইয়া দুঃখকষ্টের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়িলে তিনি যখন তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়েন, তখন মানুষ অন্তরে তাঁহারই জননীমূর্ত্তি দেখিয়া শতধারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে।

ভগবান যে আমাদের প্রেমময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। এই প্রেমই আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দেন। এই প্রেম হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তিনিই সংসারে শান্তিবিধানের জন্য সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তিনিই একমাত্র অকূলের কূল, দুর্ব্বলের বল এবং অনাথের নাথ। এই প্রেমসূত্রেই তিনি আমাদিগকে তাঁহারই শক্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের কণামাত্র দিয়াও, কেবল পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নহে, কিন্তু ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত এক অখণ্ড প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবদুপাসনার যে সত্যতত্ত্ব রোপিত হইয়াছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্রের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম জগতবাসীকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও মুক্তির উদারতম অমোঘ বাণী প্রদান করিলেন—"ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। * * * ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষ নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।" এই উদার বাণী ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের নরনারীর অন্তর হইতে আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ক পরাধীনতারই শৃঙ্খল খসিবার অবসর আসিল।

এই মুক্তিবাণী পাশ্চাত্য জগতেও কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক স্বাধীনতা আনয়নে যে সহায়তা করে নাই তাহা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ ইঁহারা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এবং পত্রব্যবহার প্রভৃতি নানা উপায়ে এই মুক্তিবাণী বহন করিবার ফলেই আমেরিকার সেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমহাসঙ্ঘের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সেই ধর্ম্মমহাসঙ্ঘ জগতের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রদানে ও মুক্তিসাধনে কি বিপুল সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের দেশেও দেখি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ মুক্তিবাণী প্রদেশে প্রদেশে সবলে প্রচারিত হইবার ফলে আজ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে ভারতের নরনারীমাত্রেরই অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ডুবাইয়া রাখিবার সর্ব্ববিধ সম্ভবপর উপায়সকল অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐ মুক্তিবাণী ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির মুক্তবায়ুতে তুলিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঐ মুক্তিবাণীর উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন, কোনও নরনারীকে বেদ-বেদাঙ্গ কোরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি আত্মোন্নতি সাধ-

নের উপায় যাহা কিছু, সে সমস্তের আলোচনা ও অধ্যয়নাদি হইতে নিরস্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সম্মুখে ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ নিত্য যোগের মহাবাণী এবং স্বাধীনতা ও উন্নতির দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে আজ শতাব্দী ধরিয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া জননীর স্নেহের আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার আর সময় নাই। পবিত্রতার নববস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। নব উৎসাহে নব উদ্যমে পুণ্যের পথে অগ্রসর হও। অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপযুক্ত মহত্ত্ব লাভ কর। যে সত্যের বলে বিশ্বজগত সুশাসিত হইয়া চলিতেছে, যে সত্যের বলে বিশ্বমানব ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে ও শুভ কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে স্থিরতর রাখিও। সংসারের ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে পশ্চাৎপদ হইও না। কথায় কথায় জনসঙ্ঘের মতে সায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীক হৃদয়ে অন্তরে ধারণ করিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। নিজের নিকট খাঁটি থাকিলে আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত তোমাকে মঙ্গলের পথ হইতে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া, সর্ব্ববিধ দীনতা ও সংশয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভর হও, এবং সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর। প্রত্যক্ষ জান যে আমরা প্রত্যেকেই সেই মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষের সন্তান। আপনাকে তাঁহার সন্তান জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার নাম দিনে নিশীথে শয়নে জাগরণে অন্তরে ধারণ কর এবং দিকে দিকে তাঁহার বিজয়-পতাকা বহন করিয়া গৃহে গৃহে নবজাগরণ আনয়ন কর।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, তবে তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। জাগ্রত ভগবানের তুমি অনুচর হইয়া থাক; তাঁহাকে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া সত্যসত্য প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; দুঃখকষ্টের কঠিন আঘাত পাইলে তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া ডাক—তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার নামের গুণে তোমার তপ্তপ্রাণে শান্তি-ধারা বর্ষিত হইবে। তুমি সংসারে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে। তোমার সমস্ত কার্য্যই মঙ্গল-প্রসূ ও মধুময় হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেমটা।

মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন—
জননী যিনি সন্তাপনাশন।
শম দম ধর চিতে নিশি দিন রে;
স্বজন দারা সুত বন্ধু কিছু না—
শুধু তাঁহারে ধর প্রাণে অনুখন।

সন্তাপিত পরাণ তাঁরে দিয়ে
শীতল কর দেহ মন রে।
হরিপদে বিমুখ অনেক দুখ পায় রে—
কঠিন দণ্ড লভে শিরে অগণিত।
ধরি' তাঁহারি পদ লভ নিত শুভমতি—
লভ আনন্দ প্রাণে নিশিদিন রে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

৩ ॰ ১ ২´ ॥
II সা রা। গা গা গা -া। -া মা ধধা পমা। পা মা গা -া I মা রা -া গা।
ম ন ভ জ রে ॰ • ॰ আ॰ •• • ন ন্দ • • • • প

৩ ॰ ১ ২´
। মা পা পা পা। -া পঃ মঃ গা মা। ণা ধা ধা -া I -া -া ধা ণা।
র ম ধ ন • • • • জ • ন নী • • • যি নি

৩ ০ ১ ২´
| ধা ধণা র্সর্সা ণধা I ণা ধা পা পা | পা -া পমা গা I -া -া গা মা |
স স্তা০ ০০ ০০ ০ প না শ ম ০ ০০ ০ ০ ০ শা ম

৩ ০ ১ ২´
| গমা পধা ণা ণধা I পা র্সা ণা ধা | পধা মপা ধণা ধা I পা মা গা গমা |
দ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ম ধ য়০ চি০ ০০ তে নি শি দি ন০

৩ ০ ১ ২´
| গমা রা রগা মপা | ধধা পমা গমা পপা | মগা রগা মমা গরা I সসা -া II
০০ ০ রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
{মা পা | পা ধা না -া | না না -া -া | র্সর্সা ননা ধপা ধনা I
স্ব জ ম দা রা ০ সু ত ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ ০ [র্রর্সা র্সা] ১
I র্সা -া র্সা -া | র্সা র্সা -া র্সা | র্রর্সর্সা -া -া -া | -া র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ব ০ সু কি ০ ছু না০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ধু তাঁ

২´ ৩ ০ ১
I না -া র্সা না | না -া র্সা ধা | ধনা র্সর্রা র্সা নধা | না ধা পা -া I
হা ০ রে ধ ন ০ ০ ০ প্রা০ ০ ০ ণে অ০ সু খ ন ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া } -া মা | গমা পধা ণর্সা ধা | ণা ধা ধা -া | -া -া -া ণণা I
০ ০ ০ ম স্তা০ ০০ ০০ পি তু প রা ০ ০ ০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I ধধা ণর্সা ণর্সঃ ণঃ ধা | ণা -া ধা পা | -া পা পা পা | -া -া মপঃ মঃ গা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ তাঁ ০ রে দি য়ে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া -া গমা | পধা ণা ণধা পা | র্সা -া -া ণা | ধা পা -া মা I
০ ০ ০ শী০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ল ক ০ র

২´ ৩ ০ [গগা]
[গা]
I মা গমা গমা রা | -া ররা রগা মপা | ধধা পমা গমা পপা |
দে হ০ ০০ ০ ০ মন রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২´
| মগা রগা মমা গরা I সসা -া II
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
{ মা পা। পা ধা না না। না -া -া -া। র্সর্সা ননা ধপা ধনর্সা I
হ রি প দে বি ছু থ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া না। র্রর্সর্সা -া -া -া। -া র্সা র্সাঃ র্সা I
অ নে ক ছ থ পা ০ য়্ রে০০ ০ ০ ০ ০ ক ঠি ন

২´ ৩ ০ ১
I না -া র্সা না। না -া র্সা ধা। ধনা র্সর্রা র্সা নধা। না ধা পা -া I
দ ০ ও ল ভে ০ ০ ০ শি০ ০০ রে অ০ গ থি ত ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া } -া মা। গমা পধা ণর্সাঃ ণঃ। ধাঃ ণঃ ধা ধা। -া ধা ধা ণণা I
০ ০ ০ ধ রি০ ০০ ০০ তাঁ হা রি প দ ০ ল ভ নি০

২´ ৩ ০ ১
I ধধা ণর্সা র্সণা ধা। ণা -া ধা পা। -া পা পা পা। -া -া মপমা গা I
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ তি শু ০ ভ ম তি ০ ০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -া গা গা গমা। পধা ণা পধা পা। র্সা -া -া ণা। ধা পা -া মা I
০ ল ভ আ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন ন্দ প্রা ০ ণে

২´ ৩ ০ ১
I মা গমা গমা রা। -া ররা রগা মপা। ধধা পমা গমা পপা। মগা রগা মমা গরা I
নি শি০ ০০ ০ ০ দিন রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´
I সসা -া IIII
০০ ০

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা।

জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে।
পুষ্প ফোটে পাখী জাগে ছুটে চলি' সবার আগে
পূজা দেবে চল নমি তাঁরে।
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে দিকে দিকে ঘণ্টা বাজে
যেথা যে যা সবে চলি' তাঁরি জয়ধ্বনি করি'
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে।

রাঙ্গাইয়া গগনথালে, উঠছে ভানু তালে তালে,
মন আর যে রইতে নারে
ঘরের কোণের আঁধারে।
এমন মধুর সকাল বেলা কোরো নাকো বৃথা খেলা,
গীতে গন্ধে সবার মাঝে
প্রাণের দেবতা দেখবে রাজে।
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

সুর ফাঁকতাল

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২
II{ ণ্দা -া পা -া্দ । মা গা । মা গ্মা পা -া I পা পা পা -া । পা পমা ।
জা ॰ গো ॰ স বে জা ॰ গো ॰ আ জি পু ॰ ণ্য দি ॰

৩ ৩ ১´ ২ ৩
। (পা ণ্দা পমা গমা)} I পা পণা দা পপা I সা সা সা রা । গা গা । মা -া -া -া I
॰ নে ॰॰॰॰॰ ॰ নে॰ ॰ ॰॰ পু জা দে ॰ বে চ ল ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩
I মা গা মা পা । পণা দা । -া পমপা মগমা -া II
ন মি তাঁ ॰ রে॰ ॰ ॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰

তেওরা

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা -া দা । না -া । র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা । র্সনা -া । র্সা -া I
পু ॰ ষ্প কো ॰ টে ॰ পা খী ॰ জা ॰ গে ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা দা -া । না -া । র্সা -া I র্সা র্সনা র্সর্ঋা । র্ঋর্সা না । ন্দা পা I
ছু টে ॰ চ ॰ লি ॰ স বা॰ ॰র্ জা ॰ গে ॰

সুর ফাঁকতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা । গা গা । মা -া -া -া I মা গা মা পা । পণা দা । -া পমপা মগমা -া II
পু জা দে ॰ বে চ ল ॰ ॰ ॰ ন মি তাঁ ॰ রে॰ ॰ ॰॰॰॰॰॰॰॰

তেওরা

১´
[নর্সা দা -া] ২ ৩ ১´ ২ ৩
II দা দা -া । না -া । র্সা -া I র্ঋা -া র্সা । র্সনা -া । র্সা -া I
সু ম ॰ ঙ্গ ॰ ল ॰ শ ॰ ঙ্খ বা ॰ জে ॰

১´
১´ ২ ৩ [র্জ্ঞর্জ্ঞা র্মা] ২ ৩ [-া]
I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞাঃ র্রঃ । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্ঋা -া । র্সা র্ঋা} I
দি কে ॰ দি ॰ কে ॰ ঘ ॰॰॰ ণ্টা বা ॰ জে ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা দা র্সনা । র্সা -া । নর্সাঃ র্ঋঃ I র্গর্সা গা -া্দ । ণ্দা -া । পা -া I
যে থা ॰॰ যে ॰ বা ॰ স বে ॰ চ ॰ লি ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা -া । পা -া । পা মা I পা পা ণা । ণ্দা -া । পা -া I
তাঁ রি ॰ জ ॰ য় ॰ ধ্ব নি ॰ ক ॰ রি ॰

সুর ফাঁকতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা । গা গা । মা -া -া -া I মা গা মা পা । পণা দা । -া পমপা মগমা -া II
পূ জা দে ॰ বে চ ল ০ ॰ ॰ ন মি তাঁ ॰ রে॰ ০ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰

তেওরা ১´ ২ ৩ [মা] ১´ ২ ৩ ১´
II {সা সা রা । গা -া । মা -া I মা মা -া । মা গা । মা -া I মা -া মগা ।
রা জা ০ ই ॰ আ ॰ গ গ ন্ থা ॰ লে ॰ উ ঠ্ ছে॰

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
। মা -া । পা -া I ণা ণা দা । দা -া । পা -া } I র্সা র্সা -া ।
ভা ॰ নু ॰ তা লে ০ তা ॰ লে ॰ ম ন ॰

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। র্ঋা -া । র্সা র্ঋা I র্সা -া ণা । দা -া । পা -া I পা পা -া । পা -া ।
আ র্ যে ॰ র ই তে না ॰ রে ॰ ঘ রে র্ কো ০

৩ ১´ ২ ৩
। পদপা মা I পা পা পা । দা -া । পা -া I
পে॰ ॰ র্ আঁ ধা ॰ রে ॰ ॰ ॰

১´ [নর্সা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
I {দা দা -া । না -া । র্সা -া I র্ঋা র্সা -া । না -া । র্সা -া I
এ ম ন্ ম ॰ ধু র্ স কা ল্ বে ॰ লা ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা র্রা । র্জ্ঞাঃ র্রাঃ । র্জ্ঞা -া I র্মা র্জ্ঞা -া । র্ঋা -া । র্সা র্ঋা } I
কো রো ॰ না ॰ কো ॰ বৃ থা ॰ খে ॰ লা ॰

১´ [ণা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা র্সা না । র্ঋা -া । র্সা র্ঋা I র্সা ণা দা । দা -া । পা -া I
গী তে ॰ গ ॰ ন্ধে ॰ স বা র্ মা ॰ ঝে ॰ :

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা -া । পা -া । পা মা I পা ণা ণা । দা -া । পা -া I
প্রা ণে র্ দে ব্ তা ॰ দে খ্ বে রা ॰ জে ॰

সুর ফাঁকতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা । গা গা । মা -া -া -া I মা গা মা পা । পণা দা । -া পমপা মগমা -া II II
পূ জা দে ॰ বে চ ল ॰ ॰ ॰ ন মি তাঁ ॰ রে॰ ০ ০ ॰॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰

মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা।

(২)

(শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, বি-এল)

এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার সাধারণ দোষ দেখাইয়া প্রকৃত শিক্ষার আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইব।

দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিচর্চ্চার ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার্থিগণ চরিত্র-গঠন পক্ষে কোনও প্রকার সাহায্য পায় না। কেবল বুদ্ধিপরিপুষ্টির ব্যর্থপ্রয়াস ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

গুরুগৃহ বলিয়া এখন কোনও পদার্থ নাই। গুরুশিষ্যে প্রাণমন আদানপ্রদানের কোনও সুযোগ নাই। আচার্য্যের সহবাসে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনাদির দ্বারা দেহমন শুদ্ধ করিবার উপায়সকল আর অবলম্বিত হয় না; তাহার ফলে দেশে ভগবৎপরায়ণতা, সার্ব্বজনীন প্রেম, স্বদেশপ্রীতি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে চলিয়াছে এবং ঘোর অধর্ম্ম, স্বার্থপরতা ও ক্লৈব্য প্রভৃতি বৈগুণ্য লোকের হৃদয় অধিকার করিতে বসিয়াছে।

অপর পক্ষে স্কুলকলেজের এই শিক্ষা লোককে সংসারের উপযোগী করিতেছে না, জীবনসংগ্রামে তিষ্ঠিয়া থাকিবার ক্ষমতা দিতেছে না। তথাকথিত শিক্ষিত যুবক কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেন অকূল সাগরে পড়িতেছে এবং সময় হারাইয়া বুঝিতেছে যে আত্মাদরই শিক্ষা করিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে নাই।

এখন প্রতিকারের উপায় কি?

প্রাচীন ঋষিগণের সময় শিক্ষার্থিগণের গুরুগৃহবাসের যে ব্যবস্থা ছিল—পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও ছাত্রগণের একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা যাহার অস্পষ্ট ছায়ামাত্র—তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই গুরুগৃহে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ এবং নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ-শিক্ষকগণ (অধিকাংশ স্থলেই স্বামী-স্ত্রী একত্রে) সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া এবং "আচিনোতি চ ধর্ম্মার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি, স্বয়মাচরতে যস্মাত্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে"—আচার্য্যের এই লক্ষণ সার্থক করতঃ ছাত্রগণকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া যাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও সুশিক্ষা-লাভ করিয়া সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হয় তাহার জন্য ব্রতী থাকিবেন; এবং যাহাতে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের যথাযথ অনুশীলন দ্বারা আত্মজীবন, গৃহস্থজীবন ও সঙ্ঘজীবন সার্থক করতঃ আদর্শ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হয়, সেবিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী, তাহারা যাহাতে বর্ণাশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানগুলি শ্রদ্ধাপূতচিত্তে পালন করিয়া চতুর্ব্বর্গলাভের অধিকারী হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

এখানে আচার্য্যগণ মাতার ন্যায় সস্নেহে ও সযত্নে শিক্ষার্থিগণকে লালনপালন করিবেন এবং নিজেদের আদর্শে যাহাতে তাহারা নিজ জীবন গঠন করিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কেবল লেখাপড়া শিখানই এইরূপ আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে শিক্ষার্থিগণ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া নিজের, সংসারের ও সমাজের উন্নতিসাধন পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে আচার্য্যগণ তাহার চেষ্টা করিবেন; কারণ, "সা হি নাম পরা শিক্ষা যয়া জীবঃ সুখী ভবেৎ।"

এখানে ছাত্রগণের উপর পুস্তকের বৃথা ভার চাপান হইবে না; অধিকাংশ সময়ে মুখে মুখে প্রকৃতির সহবাসে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং সে শিক্ষা যাহাতে ছাত্রগণের ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পূর্ণবিকাশে সমর্থ হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহে কেবল স্মরণশক্তিরই প্রধানতঃ অনুশীলন হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইলে কেবল পুস্তকপাঠ করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সুব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থিগণ যাহাতে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এজন্য বস্তুসহযোগে শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তার পর প্রকৃতির ঘটনাগুলির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যাহাতে তাহাদের কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণকে সহজ বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ দিতে হইবে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা লইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন করিতে পারিলে মানসিক বৃত্তিগুলি উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং শিক্ষার্থিরাও এরূপ শিক্ষায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে।

এখানে অযথা প্রয়োজনবৃদ্ধি বা অভাবসৃষ্টি না করিয়া বিলাসিতা পরিহার পূর্ব্বক আত্মনির্ভর অবলম্বন করিয়া সংসার পরিচালনোপযোগী শিল্পকর্ম্মাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দ্বারা, পরে যাহাতে শিক্ষার্থীরা শান্তিময় ও শান্তিপ্রদ জীবন যাপন করিতে পারে, সেইভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে।

এই আশ্রমগুলি সংসারের অনুরূপ হইবে, অর্থাৎ সংসারের যে সকল বিষয়ে মানবসন্তানকে সচরাচর নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে কার্য্যতঃ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই সকল আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র, শিল্পাগার, সমবায়-ব্যবসা এবং ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ ব্যবসাবাণিজ্যের আদর্শ অনুষ্ঠান ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে; এবং সেই সকল অনুষ্ঠান পরিচালন দ্বারা শিক্ষার্থিগণ হাতে কলমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিবে এবং সংসারে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজ নিজ অবলম্বিত অনুষ্ঠানগুলি উত্তমরূপে চালাইবার উপযোগী করিয়া নিজ নিজকে গঠন করিয়া লইবে; ফলতঃ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের জ্ঞান ও কর্ম্ম-কেন্দ্রস্বরূপ এই আশ্রমগুলি গঠিত হইবে।

শিক্ষার্থিগণ ভবিষ্যতে যাহাতে আদর্শ গৃহী হয়, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে স্ত্রীপুরুষ বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং পরস্পর পরস্পরের শ্রেষ্ঠ সখা এবং উভয়কে মিলিয়াই ব্যক্তিগত, সংসারগত, জাতিগত ও মনুষ্যগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করিতে হইবে, এইভাবেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা উপযুক্ত পিতা ও মাতা হইয়া উত্তরোত্তর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ শিক্ষাপ্রচারের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনা যায়। ইহার সার্থকতা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কিছুদিন পরীক্ষা না করিলে বুঝা যাইবে না। সেইজন্য ইহার বিরুদ্ধবাদীদের মতের বিস্তৃত আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। তথাপি যেভাবে দুই চারিটি সাধারণ আপত্তির কথা উঠিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ ইহা কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসংক্রান্ত নিয়মাদির একটা আদর্শলিপি দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথম আপত্তি এই যে, ইহা অন্ধভাবে ভারতের অতীতের অনুকরণমাত্র। অতএব যে অতীত ভারতের এই দুর্দ্দশা আনিয়াছে তাহার অনুকরণে আরও ঘোরতর দুর্দ্দশা আসিয়া পড়িবে। ভারতের অতীত কি ছিল এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য দায়ী তাহা নিরপেক্ষ গবেষণার জন্য এপর্য্যন্ত কোনও লোক জন্মান নাই এবং সেরূপ গবেষণাও হয় নাই। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ভারতের অতীতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কোনও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেইজন্য ভারতের অতীতের যে ক'টি সনাতন মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেই মূলসূত্রগুলি এই :—

(১) এক অবাঙ্মনসগোচর অব্যক্তের পরিদৃশ্যমান ব্যক্তাবস্থার ব্যষ্টিভাবের উৎকর্ষসাধন করিতে যাইয়া যেন সমষ্টির হানি না হয়। (২) সেই অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিজ নিজ ঋজুকুটিল পথ বুঝিয়া তৎতৎপথে দৃঢ়সঙ্কল্পে যাওয়াই স্বধর্ম্মপালন এবং সেই স্বধর্ম্মপালনেই অর্থকামমোক্ষ অর্জ্জন করাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। (৩) অব্যক্তের বিকাশের (অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থের) মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাহারা পারমার্থিক হিসাবে যে এক (অর্থাৎ তাহারা এক হইতে উদ্ভূত, একে অবস্থিত এবং একেই লয় প্রাপ্ত)—এই চরম সত্যের উপর ব্যবহারিক অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার স্থাপন করাই অতীত ভারতের লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণ। (৪) অন্নময় কোষের সমস্যা খুব কঠিন ও ব্যাপক হইলেও তৎপূরণে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত রাখিলে এবং নানাভাবে নানারূপে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই জীবনের লক্ষ্য করিলে মানব চিরদিনই অপর জন্তুস্তর হইতে উচ্চে উঠিতে পারিবে না। সেই জন্য অন্নময় কোষের উন্মেষ ও চরিতার্থতাকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের উন্মেষে এবং চরিতার্থতায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ এবং মানবের ভূমানন্দ-ভোগ সম্ভব হইবে।

যদি এই সনাতন সত্যের উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া অতীতের অন্ধ অনুকরণ দোষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হয় এবং জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" এবং বিশ্ববিশ্রুত স্কটের "Dwindle sons of little men"এর দোষ আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই গ্লানির ভার বহন করিয়াই আমাদের গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে দোষ গুণ বিচার করিতে করিতে চলিতে হইবে। নিন্দা ও স্তুতিবাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিস্তার উদ্দেশ্যে এবং সত্যশিবসুন্দরের বিকাশ প্রকট করিতে করিতে সচ্চিদানন্দময়ের বিকাশসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; 'নান্যঃ পন্থা অয়নায়'।

বাঙ্গালীর আত্মদ্রষ্টা মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে যে পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে ভারতের উজ্জল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ভারতের অতীত সাধনার উপর ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা করিতে যাইয়া শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরে যে সার্ব্বজনীন সত্য আছে তদনুসারে সমাজের শ্লথ ভিত্তি একণে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই

তাঁহার মহান্ উপদেশ। তদনুসারে এই শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে কি না তাহা মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

আর একদল আছেন যাঁহারা বলেন যে প্রথমাবস্থায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ইংরাজের এখানে শাসনকর্তৃত্বহিসাবে অবস্থানরূপ বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে কখনও সুফল হইতে পারে না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। আর বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার বিধান না করিলে পরে ভাল করিয়া ইংরাজীশিক্ষা সম্ভব হয় না। তাঁহারা আরও বলেন যে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে স্বদেশী ভাষার সহিত শৈশবকাল হইতেই অপর আর একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং সেইরূপ ব্যবস্থার ফলে জাতিগত ঈর্ষ্যা-দ্বেষ হ্রাস হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলনকল্পে বাস্তবিক হিসাবে ইংরেজশাসনকর্তৃত্ব উপেক্ষা করা হয় নাই। উহা যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের আত্মোদ্বোধনের, এবং আত্মচরিতার্থতার বিশেষ প্রতিকূল ইহা স্থির বুঝিয়াই তাহার প্রতিকূলাচরণের দোষ-নিবারণার্থে তাহার সহযোগিত্ব অস্বীকার করিয়াই ইহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। যখন সমাজের প্রাণসঞ্চার হইবে এবং সমাজ আত্মস্থ হইবে তখন বৈদেশিক শক্তির সহিত আদানপ্রদানের কথা উঠিতে পারে। এক্ষণে তাহা করিতে যাইলেই জীর্ণ শীর্ণ প্রাণের ধ্বংসের গতি আরও দ্রুত চলিতে থাকিবে।

বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষা না করিলে যে ইংরাজীশিক্ষা লাভ ভাল হয় না ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ মাতৃভাষা ভালরূপ শিক্ষা হইলে অপর একটি ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে অনেক ইংরেজ এখানে আসিয়া অল্পদিনে বাঙ্গলাভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাও দেখিয়াছি যে সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করার পর শেষ দুই বৎসর মাত্র ইংরাজী বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ মেধাবী ছাত্র না হইয়াও উত্তমরূপে প্রবেশিকা (matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইউরোপ বা আমেরিকাপ্রদেশে শৈশবে যে বিদেশী-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এই শিক্ষাপদ্ধতির অনুরূপ শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইলে পর বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা তৎ তৎ স্থানে আছে। সে যাহা হউক, অনাত্মস্থ ক্ষীণপ্রাণ প্রবল রাজশক্তিপ্রত্যাহত ও তাহার আপাততঃ উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ ভারতের পক্ষে শাসকের ভাষা শৈশবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আত্মোদ্বোধনের ব্যাঘাত ঘটিবে ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়।

আর একদল বলেন যে, যাঁহারা প্রচলিত শিক্ষার বিরোধী তাঁহারা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির একটা আদর্শ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই এবং এযাবৎ যাহা করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ মাত্র। ইহা খুব যুক্তিযুক্ত সমালোচনা এবং ইহা যে আমি অন্তরে অন্তরে অনেক দিনই অনুভব করিয়াছি তাহার প্রমাণ এই যে, আমি এই দোষ পরিদর্শনপূর্ব্বক ১৯১৫ সালে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। তাহা আমার প্রণীত Educational Problems নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ছাপা হইয়াছে; যাহা হউক, সেই দোষ পরিহারকল্পে আমি এই পনর বৎসরকাল প্রাণপণ প্রয়াস ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও জাতীয় জীবনসঞ্চারের এই প্রধানতম কার্য্যে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই। সেই জন্যই এক্ষণে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সম্মুখে আমার মতামত লইয়া উপস্থিত হইলাম। ভরসা এই, যদি তাঁহারা ইহাতে মঙ্গলের ও সত্যের বীজ নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই বীজের উন্মেষসাধন করতঃ ছায়াপ্রদ মহামহীরুহের আবির্ভাব সাধন করিতে কখনই বিরত থাকিবেন না। যাহা হউক, অত্র লিপিবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, যে ইহা প্রচলিত শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ নহে। অনেক স্থলেই মূলতঃ তাহার সহিত বিসদৃশ; যে সকল সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে তাহা সকল শিক্ষার অঙ্গ বলিয়াই স্থান পাইয়াছে, অন্ধ অনুকরণার্থ নহে।

এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন কার্য্য কত আয়াসসাধ্য ও কত ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মনে করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তবে মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমরা যে দুরবস্থায় এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদের পক্ষে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে বিরত থাকিলে চলিবে না। অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সামর্থ্য অনুসারে পদবিক্ষেপ করতঃ শক্তিসামর্থ্য ও অর্থসঞ্চয় করিতে করিতে এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। নচেৎ ভারতের মরণ অবশ্যম্ভাবী।

'এগ্রিকালচারেল কমিশনে' আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম তাহাতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে আরও বলিয়াছিলাম যে ইহার প্রাথমিক বিভাগে যে শিক্ষা তাহা জল বায়ু আকাশের ন্যায় সকলের পক্ষে মুক্ত ও সুলভ করিবার জন্য ইহার যাবতীয় খরচের ¾ অংশ ষ্টেট হইতে দিয়া এবং ¼ অংশ স্থানীয় লোকদিগের

নিকট হইতে লইয়া অবৈতনিক হিসাবে ভারতের প্রতি শিশুর জন্য ব্যবস্থা করা ষ্টেটের অবশ্য কর্ত্তব্য। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে সেই মন্তব্য 'এগ্রিকালচারেল কমিশনের' মন্তব্যের প্রতিকূল বিধায় কমিশনের মুদ্রিত অংশে তাহা স্থান পায় নাই। যাহা হউক, অস্থির হইয়া বসিবার মুহূর্ত্তমাত্র সময় নাই। ভারতের কল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই প্রাণপণে এই কার্য্যে লাগিয়া যাইতে হইবে। নিজ নিজ বিশিষ্ট মতবাদ ফুটাইবার অবকাশ রাখিয়া সাধারণ মতানুসারে নির্দ্ধারিত কার্য্যে সকলে একদেহে একমনে ও একপ্রাণে না লাগিলে ভারতের তথা জগতের মঙ্গলের সূচনা হইবে না।

ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে এই কার্য্যে ষ্টেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেককেই এই বিরাট ব্যাপার গঠন করিতে নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুসারে কায়মনোবাক্যে লাগিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে যদি একদিন ভারতের জীবনী-শক্তি প্রবল হইয়া উঠে তবেই ভারতের মুক্তিলাভ ও জগতের শান্তিলাভ ঘটিবে, নচেৎ নহে।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৪)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—" যেদিন * * * মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন সেইদিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল"।

১৭৯১ শক, ফাল্গুন—মাঘোৎসবে তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"যে দিবস * * * ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা * * * এই ১১ই মাঘ * * * একত্রিত হই। * * * চত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল * * * এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে"।

১৭৯২ শক ফাল্গুন—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন, তাহাতে আছে—"১১ মাঘ ইহারই জন্য স্মরণীয় যে, সকল প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম"।

১৭৯৩ শক ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতায়—"অদ্য দ্বাচত্বারিংশ বৎসর হইল, বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"।

"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া নববর্ষে প্রবিষ্ট হইয়েছে"।

১৭৯৪ বৈশাখ—"আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিলেন।"

১৭৯৫ ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ শুক্রবার চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"চতুশ্চত্বারিংশ ব্রাহ্মসমাজ উন্নত রহিয়াছে"।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ বলিলেন—"অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।"

১৭৯৬ ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল প্রতি বৎসর ১১ মাঘে ব্রাহ্মগণ * * * উৎসাহিত করেন।"

১৮০৪ ফাল্গুন—পাথুরেঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"অদ্য ব্রাহ্মসমাজ ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষে পদনিক্ষেপ করিয়েছে"।

১৮০৮ চৈত্র—"সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের অভিনন্দন-পত্র—ব্রাহ্মাব্দ ৫৮, ১১ মাঘ" এই বৎসর মহর্ষিদেবের "উপহার" প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ চৈত্র—"হরিসেনামণ্ডলী কর্ত্তৃক" শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর—১০ই ফাল্গুন ৬২ ব্রাহ্মসম্বত, ১৮১৩ শক।

১৮১৮ আষাঢ়—ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"রামমোহন রায় * * * ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।"

১৮২৮ আশ্বিন—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ইহা স্মরণ করিলে পরমানন্দ পাইবেন।"

১৮৩৭—মাঘ—ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"অবশেষে ঘটনাবশে চিৎপুর রোডের উপর জোড়াসাঁকোস্থ ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাটী (বর্ত্তমান আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মুখস্থ বাটী) ভাড়া লইয়া স্বদেশীয়দের প্রথম ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র * * * ব্রাহ্মসমাজের আদিমতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।"

"১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ অবধি * * * নূতন গৃহে

সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল"। "১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মসভার জমিখণ্ডের ক্রেতাগণ ইহাকে ট্রষ্ট সম্পত্তি করেন।"

১৮৪০ আশ্বিন—'ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লেখেন—"১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ঐ পবিত্র দিনটী ব্রাহ্মসাধারণের মাঘোৎসবের দিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ঐ দিনটীর গৌরব স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে।"

১৮৪৪ ভাদ্র ও আশ্বিন—ব্রাহ্মসম্বৎ সম্বন্ধীয় পত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—"ব্রাহ্মসমাজের জন্মাব্দের গণনা সম্বন্ধে আমার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে * * * সম্প্রতি নানাস্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলীতে ভাদ্র মাসে ভাদ্রোৎসব হইতেছে। * * * তাহার কারণ, ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখেই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়। * * * ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র যে উপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল উৎস। * * * ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসকে ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় বলিয়া গণনা করিলে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মাব্দ ৯৪ হয় এবং আগামী ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখ হইতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৫ গণনা করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার প্রতিনিধি—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৩ লিখা হইতেছে। আরও বিবেচ্য এই যে, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদী মাঘোৎসবের পর হইতে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ মাস হইতে ব্রাহ্মাব্দের গণনা করিতেছেন।"

ইহার উত্তরে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—"১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র প্রথম উপাসনাসভা সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও ইউনিটেরীয়দিগের সভাগৃহের ন্যায় ভাড়াটিয়া স্থানে হওয়াতে ঐ সভার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল। ঐ তারিখ ধরিয়া যদি ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিতে হয়, তবে অ্যাডাম সাহেবের সহিত মিলিতভাবে যে সময়ে উপাসনাসভা হইয়াছিল, তাহা ধরিয়াই বা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা হইবে না কেন? ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি নবনির্ম্মিত গৃহে যখন ব্রহ্মসভা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অবধি ধরিয়াই ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা আমাদের মতে বিধেয়। এই হিসাবেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিয়াও আসিয়াছেন। এই গণনা যখন প্রথম অবধি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তখন কোন বিশেষ কারণ বিনা এই গণনা পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

"লেখক বৈশাখ হইতে বৎসরগণনা সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়—ধর্ম্মসম্প্রদায় হউক, বা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায় হউক—নিজ নিজ প্রতিষ্ঠার দিন অবধি নূতন বৎসর গণনা করিতে থাকিলে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমস্ত ভারতে যখন ১লা বৈশাখ হইতে নববর্ষ ধরা হয়, তখন অন্য কোন দিন হইতে নববৎসর গণনা করিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। * * * যতদূর সম্ভব দেশের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কাজ করিলেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক।"

১৮৪৯ ভাদ্র—"ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা,"... শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত—"রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় চিৎপুর রোডস্থিত কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা হয়। * * প্রাগুক্ত ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার তারিখে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপর ষোলটী ব্যাখ্যান ঈশান বাবু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ বাহির করেন।......

"১৭৫১ শকের ১১ মাঘ তারিখে বর্ত্তমান আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিন হইতে গণনা করিয়া বার্ষিক উৎসবের সংখ্যা বর্ত্তমানে নিরূপিত হইয়া থাকে। রামমোহন রায় তৎপূর্ব্বে আত্মীয়সভা নামে একটী সভা—১৭৩৭ শকে স্থাপিত করেন। ঐ আত্মীয় সভাতে উপনিষদাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ আত্মীয়সভাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূচনা। আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপনাবধি উহাতে প্রথম অবস্থায় আত্মীয় সভার অনুরূপই পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি যে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রহ্মোপাসনার সূচনা হয় নাই, উহার পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়সভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না। * * "১৭৩৫ শকে রংপুর হইতে রাজা কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। * * * ১৭৩৭ শকে রাজা মাণিকতলায় নিজ উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার বঙ্গীতলা বাটীতে সভা হইত। তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মাণিকতলার উদ্যানে সভা আরম্ভ হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে আত্মীয়-